আসিয়াছিল যে, এখনকার শিশুদিগের প্লীহা যকৃতের বিবৃদ্ধিজন্য বড় বড় চিকিৎসক ডাকিবার প্রয়োজন হইত না, ষোল টাকা বত্রিশ টাকা ভিজিট দিয়া ডাক্তার ডাকিয়া দিনের মধ্যে পাঁচবার মিকশ্চার ও তিনবার লোসন প্রয়োগের ব্যবস্থায়ও প্রয়োজন হইত না।

কালমেঘের রস, আলুইয়ের বটে—এইরূপ যা হয় একটা কিছু সেবন করানর ব্যবস্থা তখনকার স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত অবগত থাকিতেন। প্লীহায় চোনা খাওয়ান চোনার স্বেদ দেওয়া—এসকল যে ব্যবস্থা ছিল—এখনকার বড় বড় ঔষধ তাহার কাছে হারি মানিয়া থাকে।

ফল কথা—সমস্ত ঔষধের মধ্যে পাচন মুষ্টিযোগ ও টোট্‌কা ঔষধ যেরূপ ফলপ্রদ অন্য কোন ঔষধই সেরূপ ফলদায়ক নহে।

সর্ব্বৌষধেষু পাচন মৃষিভিঃ শ্রেষ্ঠমুচ্যতে।
যতো ব্যাধি প্রপীড়িতং স্বস্থং করোতি
সত্বরম্॥

অর্থাৎ সকল প্রকার ঔষধের মধ্যে ঋষিগণ পাচনকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গিয়াছেন। কারণ ব্যাধি প্রপীড়িতগণ পাচন সেবন করিলে যেমন সত্বর স্বাস্থ্য লাভ করিয়া থাকে, অন্যান্য ঔষধে তত শীঘ্র ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই জন্যই পাচনের ব্যবহার জানা একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু এই পাচন চিকিৎসা অধুনা দেশ হইতে একেবারে লুপ্ত হইতেছে।

অস্ত্র চিকিৎসান্নোতি।

(ডাঃ শ্রীনলিনীনাথ মজুমদার)

দেশের সম্রাট প্রণোদিত চিকিৎসা প্রণালী বলিয়া দেশীয় জন সাধারণ প্রগাঢ় রাজ ভক্তি প্রভাবে অবিচার্য্য ভাবে এক বাক্যে এলোপ্যাথিক চিকিৎসার পক্ষপাতী। সে চিকিৎসার কুফল সহস্র বার উপভোগ করিলেও কেহই যে কোন রোগ হইবামাত্র সর্ব্বপ্রথমে সাগ্রহে এলোপ্যাথিক চিকিৎসকের আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়া থাকে। কিন্তু অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি যে ইহার উপর আন্তরিক বীতশ্রদ্ধ, তাহারও অনেক সন্ধান পাওয়া যায়; তথাপি তাঁহারা এলোপ্যাথিরই শ্রেষ্ঠত্ব দিয়া থাকেন এবং রোগ হইলেই নিজের ইচ্ছায় বা আত্মীয় স্বজনগণের উত্তেজনায় সর্ব্ব প্রথমে এলোপ্যাথিক ডাক্তার ডাকিতেও বাধ্য হন, এসব কথা সর্ব্বজন বিদিত। এটা যে কি মোহ তাহা বুঝিতে পারি না।

এইরূপে অধিকাংশ ব্যক্তি চিকিৎসা সেই প্রণালীতে করাইয়া বিফল মনোরথ হইলে পর আয়ুর্ব্বেদিক বা হোমিওপাথিক উভয়ের যে কোন একটি চিকিৎসার আশ্রয় লইয়া তবে রোগ মুক্ত হইয়া থাকেন। এই তো অবস্থা, কিন্তু অস্ত্রচিকিৎসা বিষয়ে সকলেই এলোপ্যাথির জয় ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

গুণ কর্ম্মাদির আধিক্য দ্বারাই সকল বিষয়ের শ্রেষ্টত্ব প্রতিপন্ন হয়। অস্ত্রচিকিৎসা বিষয়টীর কি কি গুণ কর্ম্মের লক্ষণ দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করা যাইবে? রোগ শব্দে

দুঃখজনক কারণকে বুঝায়। দুঃখ জনকত্বং ব্যাধিত্বং সুতরাং আরোগ্য শব্দে তদ্বিপরীত অর্থাৎ সুখ বুঝাইবে। তাহা হইলেই যে চিকিৎসায় রোগ সকল রোগীর সর্ব্ববিষয়ক সুখকর ভাবে (যাপ্য না হইয়া) প্রকৃত আরোগ্য সাধিত হয় তাহাকেই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিতে হইবে। কথাটা ভাল করিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, সুখ সেব্য সুমিষ্ট ঔষধ দ্বারা অতীব সংক্ষিপ্ত ভাবে বিনা আড়ম্বড়ে ঠিক যেন মন্ত্রশক্তির ন্যায় দ্রুত গতিতে স্থায়ী আরোগ্যকারী চিকিৎসা-প্রণালী সেই চিকিৎসাকেই শ্রেষ্ঠতম আসন প্রদান করা উচিত।

অস্ত্র চিকিৎসা ব্যাপারটীর বিশদ আলোচনায় আমরা দেখিতে পাই, "অস্ত্র করাই একান্ত প্রয়োজন"—এই কথাটী শ্রবণ মাত্রেই রোগীর আত্মা উড়িয়া যায়। তারপর সেই বিষম ক্রিয়ার সময় নিরূপিত হইলে সেই অস্ত্রধারী প্রভু কখন যে তাঁহার ঘাতন যন্ত্র হস্তে লইয়া ভীষণ মূর্ত্তিতে সমাগত হইবেন, কখন বা আমাকে সেই প্রাণান্তকর অস্ত্র যাতনা সহ্য করিতে বাধ্য করিবেন এইরূপ নানা বিভীষিকায় রোগীর মন প্রাণ আকুল হইয়া উঠে। অনন্তর যেই অস্ত্রধারী মহাপুরুষ বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন—এই সংবাদ রোগীর কর্ণগোচর হইবামাত্র হৃৎকম্পের সূচনা হইতে লাগিল। এ অবস্থায় কাহারও কাহারও মূর্চ্ছা পর্য্যন্ত হইতে দেখিয়াছি। অস্ত্রের আনুষ্ঠানিক ব্যাপার সম্পন্ন হইলে তদ্দর্শনে রোগীর পঞ্চাত্মা যে বিশুষ্ক হইয়া উঠে—পাত্রের রক্ত পর্য্যন্ত শুষ্ক হয়—মুখের বিশুষ্কতাই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তৎপর অস্ত্রধারীর গৃহ প্রবেশ এবং রোগীকে ধর পাকর করিয়া অস্ত্র ক্রিয়ার স্থানে আনয়ন করা হয়, তখনকার অন্তর্যাতনা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। অনন্তর যখন সেই বীর পুরুষ অস্ত্র ধারণ করিয়া সমীপবর্ত্তী হন তখন রোগীর আত্মার সন্ধানই নাই। পরিশেষে যখন ক্রিয়া আরম্ভ হয় তখন দাঁত মুখ সিটকাইয়া তীব্র চিৎকার ও উচ্চক্রন্দন সহ ত্রাহি মধুসূদন রব আরম্ভ হয়। তাই কি অব্যাহতি আছে? তৎপর আবার ড্রেসিং ক্রিয়া! এই ভীষণ ক্রিয়া ক্ষত আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত সমানভাবে দুইবেলা কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে" গোছের ব্যাপার সহ্য করিয়া দিন কাটাইতে হইবে। তা' ছাড়া বাহ্য প্রযুক্ত ঔষধের অসহ্য যন্ত্রণা তো আছেই। রোগীকে এতাদৃশ দুঃসহ কষ্ট প্রদানই কি চিকিৎসার সুসঙ্গত ও সমীচীন উপায়? ইহা ভিন্ন কি আর কোন সুখকর উপায়ই জগতে নাই? এই ত গেল অস্ত্র ক্রিয়া ব্যাপার। তারপর অস্ত্র ক্রিয়াতেও চিকিৎসা সমাধা হইবে না। ক্ষত চিকিৎসা করিয়া প্রকৃত নিরাময় সাধন করা চাই। কিন্তু এ্যালোপ্যাথিক প্রণালীর ভেষজ চিকিৎসা (*medical Treatment*) যে কতদূর আরোগ্যকর তাহার আভাসতো পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে যদি সেই ঔষধ প্রকৃত নিরাময়কারী না হয় তাহা হইলে অস্ত্র চিকিৎসা স্থলেই বা তদ্বিপরীব কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে?

অধিকাংশ ক্ষত চিকিৎসার পরিণামে উহা সম্পূর্ণ রূপে আরোগ্য না হইয়া যাপ্য হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেহেতু কোন স্থানের ক্ষত এলোপ্যাথিক ঔষধে শুষ্ক হইলে সে স্থানের অল্প অল্প বেদনা এবা স্ফীতি বহুদিন স্থায়ী হওয়া প্রায় স্বাভাবিক।

ফল কথা যে চিকিৎসার আদ্যন্ত দুঃখজনক অশান্তিকর এবং অনেক সময় জীবননাশক সে চিকিৎসা কখনই সুখজনক নহে।

যে দেশে কবিরাজী ও হোমিওপথিকই দুইটী বিজ্ঞানযুক্ত চিকিৎসা বর্ত্তমান, আমি ডাক্তার হইয়াও বলিতেছি, আমাদের দেশবাসীর সেই দুইটি চিকিৎসারই শরণ গ্রহণ আমাদের পক্ষে একান্তই মঙ্গলজনক। দেশীয় কবিরাজদিগের গাছ গাছড়া দ্বারা আসুরী অস্ত্র চিকিৎসার কার্য্য সহজে সিদ্ধ হইয়া থাকে, ইহা বহুস্থলে প্রত্যক্ষ করিয়াছে।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

পরিদর্শন। সংপ্রতি গবর্ণমেণ্ট নিয়োজিত আয়ুর্ব্বেদ কমিটি অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ঐ কমিটির অন্যতম সদস্য মেজর গেল সাহেব ঐ দিন সকলের সহিত আসিতে না পারায়—তিনি তাহার পর আর একদিন একাকী আসিয়াছিলেন। কমিটির সকল সদস্যই এই বিদ্যালয় ও হাসপাতালের সমস্ত তথ্য অবগত হইয়া প্রীতিলাভ করিয়া গিয়াছেন। আমাদের আশা আছে, এই কমিটি হইতে এই বিদ্যালয় মহামান্য গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরের সহানুভূতি লাভে সমর্থ হইবে।

বৈদ্য বান্ধব সমিতি। গত ২৬শে চৈত্র রবিবার অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় কলুটোলায় সেন মহাশয়দিগের ভবনে এই সমিতির অষ্টম বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন মহাসমারোহে হইয়া গিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী এম-এ, এল, এম, এস মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিভাষণ অতি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। সভায় কয়েকজন বক্তাও বক্তৃতা করিয়া সকলকে পুলকিত করিয়াছিলেন। বৈদ্যজাতির সংক্রামক রোগ পণ প্রথা নিবারণের জন্য কিন্তু সেদিন কোন কথা উত্থাপিত হয় নাই—বৈদ্য বান্ধব সমিতি এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা মনোযোগী হউন—ইহাই আমরা দেখিতে ইচ্ছা করি।

মধ্য ভারতে আয়ুর্ব্বেদ। মধ্য ভারত বা সি, পি, গবর্ণমেণ্ট এক সার্কুলার জারি করিয়াছেন যে, ২ জন গ্রাজুয়েট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার জন্য কলিকাতা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের জন্য প্রবিষ্ট হইলে প্রত্যেককে মাসিক একশত টাকা করিয়া দুই বৎসরের জন্য বৃত্তি প্রদান করিবেন। অতি সুসংবাদ, সন্দেহ নাই। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য চিকিৎসায় শিক্ষিত তিনজন কবিরাজ ও তাঁহারা এই বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। ঐ চিকিৎসক তিনজন সেণ্ট্রাল প্রভিন্সের তিনটি স্থানের দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার প্রাপ্ত চিকিৎসক হইবেন। মধ্যভারতের দৃষ্টান্ত সকল প্রদেশের কর্ত্তৃপক্ষগণেরই অনুকরণ করা কর্ত্তব্য।

অবকাশ। অতিরিক্ত গরম পড়ার জন্য এবার অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের গ্রীষ্মাবকাশ একটু আগেই প্রদান করা হইল। ২৫শে চৈত্র হইতে ২৭শে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত এই উপলক্ষে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় বন্ধ থাকিবে। এবার এই বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষায় দিন স্থির হইয়াছে আগামী ৫ই আষাঢ়।

কলিকাতার স্বাস্থ্য। কলিকাতার স্বাস্থ্য মোটের উপর এ সময় ভালই দেখা যাইতেছে কিন্তু বড়বাজার অঞ্চলে প্লেগের আক্রমণ দেখা দিয়াছে। হাম বসন্তও সর্ব্বত্র অল্লাধিক পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে।

কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্থ কর্ত্তৃক গোবর্দ্ধন প্রেস হইতে মুদ্রিত
ও ১৭।১৯নং শ্যামবাজার ব্রিজ্ রোড্ হইতে মুদ্রাকর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

আয়ুর্ব্বেদ

৭ম বর্ষ } বৈশাখ ১৩৩০ সাল। { ৮ম সংখ্যা।

চরক ও সুশ্রুত।

(কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত এইচ, এম্, বি)

—:•:—

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা যে সকল প্রকার চিকিৎসার মূল, ইহা বড় বড় সাহেব ডাক্তারেরাও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং সে কথা লইয়া বাগ্‌বিতণ্ডা করিবার বিশেষ কিছু প্রয়োজন নাই। সত্য ও ত্রেতার সন্ধিক্ষণে প্রাণী সকল যখন রোগ পীড়িত হইতে লাগিল, মহর্ষি ভরদ্বাজ সেই সময় অমরনাথ ইন্দ্রের নিকট হইতে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া আসিলেন। ত্রিকালদর্শী অন্যান্য ঋষিগণও প্রকৃতিপুঞ্জের দীর্ঘায়ু কামনায় ভরদ্বাজের নিকট হইতে উহার শিক্ষা আয়ত্ত করিলেন। "চরক সংহিতা" এই সময় রচিত হইয়াছিল। এজন্য "চরক"—ঋষিযুগের আয়ুর্ব্বেদের আদি গ্রন্থ। আরবীয়েরা এই চরকের অনুবাদ করিয়া নামকরণ করিয়াছিলেন—সরক।

সুশ্রুত সংহিতা চরকের অনেক পরে বিরচিত। মহর্ষি ভরদ্বাজ যেমন ইন্দ্রের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়াছিলেন, ধন্বন্তরিরও সেইরূপ উপদেষ্টা:বা গুরু—দেবরাজ ইন্দ্র। ধন্বন্তরিই এই বিদ্যা শিক্ষা করিয়া দেবগণের জরাব্যাধি ও মৃত্যু নিবারণ করিয়াছিলেন এবং শল্য তন্ত্রাদি অষ্টাঙ্গ সম্পূর্ণ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র শিক্ষা দিবার জন্য পৃথ্বীতলে অবতীর্ণ হইয়া মানব রূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের পুত্র সুশ্রুত এবং অন্যান্য আর্য্যঋষি এই বিদ্যা দিবোদাস বা ধন্বন্তরির নিকট উত্তমরূপে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। মহর্ষি সুশ্রুত প্রণীত "সুশ্রুত সংহিতা" তন্মধ্যে অন্যতম। বর্ত্তমান সময়ে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক দিগের শল্যবিদ্যা শিক্ষা করিবার ইহাই প্রধান গ্রন্থ। এই মহাগ্রন্থও আরবী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান অধুনা শল্যবিদ্যার চরমোন্নতি সাধন করিয়া জগদ্বাসী ব্যক্তিবৃন্দকে

চমৎকৃত করিয়া তুলিয়াছে—তাহার মূল ভিত্তি হইল এই সুশ্রুতসংহিতা। কিঞ্চিদধিক আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই মহাগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।

চরক ও সুশ্রুত—দুইখানি মহাগ্রন্থই আয়ুর্ব্বেদ-জলধির অত্যুজ্জল রত্ন। যিনি এই দুই খানি গ্রন্থ ভাল করিয়া পাঠ করিয়াছেন, তিনি কখনই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাকে অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা বলিয়া ভ্রমে পতিত হইবেন না। অধুনা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকদিগের ভাগ্যবিপর্য্যয়ে ঐ দুইখানি মহাগ্রন্থের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া চিকিৎসা করা দেশ হইতে একরূপ লোক পাইয়াছে, কিন্তু এমন একদিন ছিল—যেদিন এই দুইখানি মহাগ্রন্থের অমৃতাস্বাদ পাইবার জন্ত সমগ্র বিশ্ব উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। আরব দেশের অধিবাসী বৃন্দ তাহাদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান।

চরক ও সুশ্রুত উভয় সংহিতা পাঠেই অবগত হওয়া যায়,—শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মার পরস্পর সংযোগকে আয়ু বলে। এই আয়ুর হিতাহিত, ব্যাধির নিদান ও প্রশমনের উপায় যে শাস্ত্রে বর্ণিত, তাহারই নাম আয়ুর্ব্বেদ। এই আয়ুর হিতাহিত—কথাটির বিশ্লেষণ করিবার জন্ত চরক এবং সুশ্রুত উভয় সংহিতাকারকেই আগম, প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং উপমানের বহুল প্রমাণ প্রয়োগ করিতে হইয়াছে। উভয় সংহিতাকার স্ব স্ব সংহিতায় পুরুষ কি,—ব্যাধি কি,—স্থাবর কি,—জঙ্গম কি,—আগ্নেয় পদার্থ, সৌম্য পদার্থ, ঔষধি বিবরণ, ব্যাধি সঙ্কয়াদির হেতু অনেক কথারই বিশদভাবে মীমাংসা করিয়া দিয়া তাহার পর চিকিৎসার সূত্রের প্রাঞ্জল ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এক কথায় চরক ও সুশ্রুত কেবল চিকিৎসার গ্রন্থ নহে, বিশ্ববাসীর সার্ব্বজনীন শিক্ষা এই দুই খানি মহাগ্রন্থে নিহিত। আমাদের মনে হয়, কাহারও চিকিৎসা ব্যবসায় করিবার উদ্দেশ্য না থাকিলেও আয়ুর্ব্বেদের অত্যুজ্জল রত্ন এই দুইখানি মহা গ্রন্থ ভাল করিয়া পড়িয়া রাখিলে, তাঁহাকে আর সংসার ধর্ম্ম পরিচালনায় কোনোরূপ কষ্ট পাইতে হয় না।

বায়ু, পিত্ত ও কফ আয়ুর্ব্বেদের মূলভিত্তি। দেহোৎপত্তির কারণও এই তিনটি। আয়ুর্ব্বেদ বলেন,—

"বাত পিত্ত শ্লেষ্মণি এব দেহ সম্ভব হেতবঃ। তৈরেবাব্যাপন্নৈরধোমধ্যোর্দ্ধ সন্নিবেষ্টৈঃশরীরমিদং ধার্য্যতেহগারমিব স্থূণাভিস্তি সৃভিরতশ্চ ত্রিস্থূণমাহুরেকে। ত এবচ ব্যাপন্নাঃ প্রলয়হেতবস্তদেভিরেব শোণিত চতুর্থৈঃ সম্ভব স্থিতি প্রলয়েষ্বপ্য বিরহিতং শরীরং ভবতি। ভবতি চাত্র। নর্ত্তে দেহঃকফাদস্তি ন পিত্তান্ন চ মারুতাৎ। শোণিতাদপি বা নিত্যং দেহ এতৈস্তু ধার্য্যতে। সুশ্রুত সূত্র স্থান একবিংশতিতমোহধ্যায়।

অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনটি দেহোৎপত্তির কারণ বলিয়া জানিবে। অব্যাপন্ন(অবিকৃত) বায়ু, পিত্ত ও কফ—এই তিনটি দেহের অধঃ মধ্য ও উর্দ্ধদেশে অবস্থিত হইয়া তিনটি স্থূণ অর্থাৎ স্তম্ভ দ্বারা সংস্থিত গৃহের ন্যায় শরীরকে ধারণ করিয়া রাখে। এই নিমিত্ত কেহ কেহ এই দেহকে ত্রিস্থূণ আগার নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। এই বায়ু, পিত্ত কফ ব্যাপন্ন অর্থাৎ বিকৃত হইলে দেহ প্রলয়ের অর্থাৎ বিনাশের হেতু হইয়া থাকে। পরন্তু

এই দোষত্রয় অর্থাৎ বাত, পিত্ত ও কফ এবং শোণিত এই চারিটি পদার্থ উৎপত্তি, স্থিতি প্রলয়কালেও অবিরহিত ভাবে দেহ মধ্যে অবস্থিতি করিয়া থাকে জানিবে। সুতরাং বাত, পিত্ত, কফ ও রক্ত—এই দ্রব্য চতুষ্টয় ব্যতীত কিছুতেই শরীর রক্ষিত হইতে পারেনা বলিয়া উহারা নিয়ত এই দেহকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

এই বায়ু, পিত্ত ও কফ কিরূপে শরীরকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, তাহা বুঝাইবার জন্য ঋষি বলিয়াছেন,—

"বিসর্গাদান বিক্ষেপৈঃ সোম সূর্য্যানিলা যথা।
ধারয়ন্তি জগদ্দেহং কফ পিত্তানিলা স্তথা॥"

অর্থাৎ যেমন চন্দ্র স্বীয় শীত কিরণ অর্থাৎ শীতলতা প্রদান করিয়াও সূর্য্য আপনার উষ্ণরশ্মি দ্বারা চন্দ্রের শীতলতা আকর্ষণ (গ্রহণ) পূর্ব্বক উষ্ণতা প্রদান করিয়া এবং বায়ু ঐ উভয়ের সঞ্চালন দ্বারা জগতকে ধারণ করিয়া রাখে, সেইরূপ কফ—শৈত্য দ্বারা শরীরকে আর্দ্র করে ও পিত্ত—উষ্ণতা দ্বারা শুষ্ক করে এবং বায়ু স্বীয় গতি প্রবাহ দ্বারা উক্ত শীতোষ্ণাদি সঞ্চালন পূর্ব্বক দেহকে রক্ষা করিতেছে!

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার মূল সূত্র এই বায়ু, পিত্ত ও কফের প্রত্যেকটি আবার পাঁচ ভাগে বিভক্ত! বায়ুর শ্রেণী বিভাগে ইহাদিগের নামকরণ হইয়াছে প্রাণ, অপান সমান, উদান ও ব্যান। পিত্তের নাম করণে উহাদিগের সংজ্ঞা হইয়াছে পাচক, রঞ্জক, সাধক, আলোচক ও ভ্রাজক এবং কফের সংজ্ঞা নির্ণয়ে উহাদিগকে বলা হইয়াছে ক্লেদক, অবলম্বক, বোধক, তর্পক ও শ্লেষ্মক। বায়ুর এক কথায় পরিচয় উহা গমনাদি শারীর চেষ্টা সমূহের প্রবর্ত্তক। শরীরের উচ্চাবচ স্থান সমূহের নিয়ন্তা, মনের প্রণেতা, সর্ব্বেন্দ্রিয়ের উদ্যোগকারক সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অভিবাহক, সর্ব্ব শরীরস্থ ধাতু দিগের বাহক, শরীরের সন্ধান কারক, বাক্যের প্রবর্ত্তক, কর্ণের শব্দ বোধ ও স্পর্শেন্দ্রিয়ের স্পর্শবোধের মূল, হর্ষ ও উৎসাহের যোনি, অন্তরাগ্নির দোষ নাশক, মল সমূহের নিষ্কাশক, স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় বিধ মাগের ভেদকারী, গর্ভাকৃতির কর্ত্তা এবং আয়ুর আধারীভূত। বায়ু শরীরে কুপিত হইলে শরীরকে নানাবিধ রোগ দ্বারা ক্লেশিত করে। এই বায়ুই উৎপত্তির কারণ, আবার ও ভূতগণের সৃষ্টি সংহার কারক।

পিত্তের পরিচয়ে আমরা জানিতে পারি, প্রাণীদিগের দেহ মধ্যে যে অগ্নি বিদ্যমান, পিত্ত তাহারই নামান্তর। এই পিত্তই জীব দেহে দাহন ও পাচন প্রভৃতির কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে। এই পিত্ত ক্ষীণ হইলে অগ্নি গুণবিশিষ্ট তীক্ষ্ণ ও উষ্ণাদিতে পিত্তের সমান গুণান্বিত দ্রব্য দ্বারা উহা বর্দ্ধিত হয়, পিত্ত অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইলে শীতল ক্রিয়া দ্বারা প্রশমিত হয়।

কফ—পিত্তের বিরুদ্ধ গুণ বিশিষ্ট। পিত্তের গতি জীব দেহে ঊর্দ্ধদিকে ধাবমান হইয়া থাকে, এই জন্যই কফের আশ্রয়—আমাশয়—পিত্তাশয়ের উপরি সংস্থিত। যেরূপ দিক দর্শনে সূর্য্যের উপরি চন্দ্র অবস্থিত থাকায় সূর্য্যের উষ্ণ কিরণের আধার স্বরূপ, সেই প্রকার আমাশয় পিত্তের তেজঃ ক্রিয়ার আধারস্থল হেতু ভোজ্য, ভক্ষ্য, লেহ্য ও পেয়

এই চতুর্ব্বিধ আহারেরও আধার বলিয়া জানিবে। এই চতুর্ব্বিধ আহার দ্রব্য উদক গুণ অর্থাৎ দ্রব স্নেহাদি দ্রব গুণ যুক্ত, আমাশয়িক রস দ্বারা ক্লেদ ভাবাপন্ন ও শিথিল সংযোগ হইয়া সুখে পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া থাকে জানিবে।

উপরে অতি সংক্ষেপে বায়ু, পিত্ত ও কফের পরিচয় প্রদত্ত হইল মাত্র, নতুবা এই তিনটির বিশদ পরিচয় দিতে হইলে প্রবন্ধ অতি বৃহৎ হইয়া পড়ে। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা এই বায়ু, পিত্ত ও কফের উপরই সংস্থিত। এই বায়ু, পিত্ত ও কফ কুপিত হইলেই প্রাণীদিগকে রোগগ্রস্ত হইতে হইবে—ইহাই আর্য্যঋষির অমূল্য উপদেশ। মহর্ষি সুশ্রুত, এই বায়ু, পিত্ত, কফ এই ত্রিদোষের সঞ্চয়, প্রকোপ ও প্রশমনের বিষয় বুঝাইবার জন্য দোষ ও সঞ্চয়াদি ভেদে ঋতুবিভাগ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা চিকিৎসা ব্যবসায়ী কেন, সকল গৃহস্থেরই পাঠ করা উচিত। পৃথিবীর কোনো চিকিৎসা শাস্ত্রে স্বাস্থ্যরক্ষা বিধি সকল এরূপভাবে সুবিন্যস্ত আছে কিনা জানিনা। ঐ উপদেশ বর্ণে বর্ণে পালন করিতে পারিলেই স্বাস্থ্যরক্ষা করা হয়।

ঋষি উপদেশের কোন্ কথাটা স্বাস্থ্য রক্ষায় বিহিত বলিব না? চরক ও সুশ্রুতের প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রত্যেক ছত্রই স্বাস্থ্যরক্ষার উপদেশ প্রদানের জন্য লিখিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। বায়ু প্রকোপের কারণে সুশ্রুত বলিয়াছেন,—বলবান ব্যক্তি দিগের সহিত অতিরিক্ত ভাবে কুস্তি করিলে, অত্যন্ত স্ত্রী সংসর্গ করিলে, অধিক অধ্যয়ন করিলে, উচ্চস্থান হইতে পতিত হইলে, অতি দ্রুত দৌড়াইলে, অতিশয় শরীর মর্দ্দন করিলে, লগুড়াদি আঘাত প্রাপ্ত হইলে, বেগের সহিত গর্ত্তাদি অতিক্রমণ করিলে, লাফাইয়া লাফাইয়া চলিলে, অতিরিক্ত সন্তরণ প্রদান করিলে, রাত্রি জাগরণ করিলে, ভারবহন করিলে, হস্তী, অশ্ব, গাড়ী ও পদদ্বারা অধিক গমন করিলে, কটু, তিক্ত, কষায়, রুক্ষ, শীতল, শুষ্ক শাক, শুষ্ক মাংস, বন্য কোদোধান্য প্রভৃতি ভোজন করিলে, অল্প ভোজন বা উপবাস করিলে, বহু ভোজন বা অকালে ভোজন করিলে, অজীর্ণাবস্থায় ভোজন করিলে, অধোবায়ু, মূত্র, পুরীষ, শুক্র, বমি, হাঁচি, উদগার ও ক্রন্দন এই সকলের বেগ ধারণ করিলে বায়ু কুপিত হইয়া থাকে।

পিত্ত প্রকোপের কারণে ঋষি বলিয়াছেন,—ক্রোধ, শোক, ভয়, পরিশ্রম, উপবাস, বিদগ্ধ (ভুক্ত দ্রব্য অম্লপাক হেতু কষ্টে জীর্ণ হওয়া) মৈথুন, উপগমন, কটু, অম্ল, লবণ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, লঘু, বিদাহী, তিল তৈল, তিল বাটা, ছাগমাংস, মেষ মাংস, দধি, তক্র, সুরা সেবন ও আতপ সেবনে পিত্ত প্রকুপিত হয়।

শ্লেষ্মা প্রকোপের কারণ-নির্ণয়ে ঋষির মীমাংসা—দিবা নিদ্রা, আদৌ পরিশ্রম না করা, অলসতা, মধুর, অম্ল, লবণ, শীতল, স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল, ক্লেদজনক, গোধুম, তিল, পিষ্ট বিকৃতি (চাউলের পিঠা), দধি, দুগ্ধ, পায়স, ইক্ষু বিকার (গুড় প্রভৃতি) মহিষ, বরাহাদি মাংস, কচ্ছপ মাংস, কেশুর, পানিফল, তাল, নারিকেলাদি, লাউ, কুমড়া এই সকল দ্রব্য নিত্য সমানভাবে ভোজন এবং অজীর্ণ সত্বে ভোজনে শ্লেষ্মা প্রকুপিত হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যাহাতে আয়ুর কথা বর্ণিত থাকে তাহারই নাম আয়ুর্ব্বেদ। এই আয়ুর হিতাহিত বুঝাইবার জন্তই মহর্ষি চরক ও সুশ্রুতের এত কথা বলিবার আবশ্যক হইয়াছে। সেই জন্তই বলিতেছিলাম চরক ও সুশ্রুত শুধু চিকিৎসা গ্রন্থ নহে, গৃহ পঞ্জিকার ন্যায় সকল সংসারেই ইহা রক্ষিত হওয়া উচিত।

শরীরের মূল কি—ইহা বুঝাইবার জন্ত সুশ্রুত বলিয়াছেন, যেমন বৃক্ষাদির উৎপত্তি, জীবন ও বিনাশের পক্ষে মূলই প্রধান, সেই রূপ প্রাণীগণের উৎপত্তি, স্থিতি ও ধ্বংসের পক্ষে বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা ত্রিদোষ, রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সপ্ত ধাতু এবং পুরীষাদি মল—শরীরের মূল জানিবে। বায়ু, পিত্ত, কফের দ্বারা দেহীদিগের কি কার্য্য সাধিত হইতেছে তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করা হইয়াছে। রস ধাতুর দ্বারা শরীরের প্রীণন অর্থাৎ স্নিগ্ধতা প্রভৃতি কার্য্য ও রক্তের পোষণ ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়াছে। রক্তের দ্বারা বর্ণের প্রসন্নতা, মাংসের পোষণ ও জীবন ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতেছে। মাংসের দ্বারা শরীরের পোষণ ও মেদের পুষ্টি সাধিত হইতেছে। মেদের দ্বারা স্নেহ ও স্বেদের পোষণ ও অস্থির দৃঢ়তা সম্পাদিত হইতেছে। অস্থির দ্বারা দেহ ধারণ ও মজ্জার পোষণ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতেছে। মজ্জার দ্বারা প্রীতি, স্নেহ, বল ও শুক্রের পোষণ এবং পূর্ণতা নির্ব্বাহিত হইতেছে। শুক্রের দ্বারা ধৈর্য্য, স্খলন, প্রীতি, দেহের বল, হর্ষ ও বীজার্থ অর্থাৎ গর্ভের প্রয়োজন নির্ব্বাহ হইতেছে। পুরীষের দ্বারা—শরীর ধারণ এবং বায়ু ও অগ্নি ধারণক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতেছে। মূত্রের দ্বারা বস্তির পূরণ ও আহারাদির ক্লেদ নিঃসরণ কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। চরকের চিকিৎসা স্থানের রসায়ন অধ্যায় ইহারই ভিত্তির উপর লিখিত। চরক বলিয়াছেন,—

"লাভো পায়োহি শস্তানাং রসাদীনাং রসায়নম্।

অর্থাৎ রসাদি ধাতু সমূহ লাভ করিবার উপায় স্বরূপ বলিয়াই ইহার নাম রসায়ন। রসায়ন ঔষধ সেবন করিলে—

দীর্ঘমায়ু স্মৃতিং মেধামারোগ্যং তরুণং বয়ঃ।
প্রভাবর্ণ স্বরৌদার্য্যং দেহেন্দ্রিয় বলং পরম।"

অর্থাৎ দীর্ঘ আয়ু স্মৃতি, মেধা, আরোগ্য তরুণতা, প্রভা, বর্ণ ও স্বরের পুষ্টি, দেহ ও ইন্দ্রিয়দিগের বল, বাকসিদ্ধি, প্রণতি ও কান্তি লাভ হইয়া থাকে। রোগ-বিশেষে আক্রান্ত হওয়ার কথা ছাড়িয়া দিলেও নানা কারণে মানবের ষড় ধাতুর ক্ষয় সর্ব্বদাই হইতেছে, আর্য্য ঋষি তাহা চিন্তা করিয়াই চিকিৎসা স্থানের প্রথমেই রসায়ন চিকিৎসার কথা আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই রসায়ন চিকিৎসা আয়ুর্ব্বেদের মহান্ গৌরব। এরূপ চিকিৎসাও অন্য চিকিৎসা-শাস্ত্র এখনও অধিগত করিতে সমর্থ হয় নাই।

অপত্য কামী পুরুষ ও স্ত্রীলোক মাত্রেরই শুক্র ও শোণিতের বিশুদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। সুশ্রুতের অমূল্য উপদেশে এ সকল কথাও বিশদ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ঋতুমতী নারীর কর্ত্তব্য, ঐ সময়ে পুরুষের কর্ত্তব্য,—কিরূপ নিয়মে থাকিলে সুসন্তানোৎ

পত্তি হইয়া থাকে—এসব কথাও মহর্ষি সুশ্রুত অতি পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়াছেন। এসব উপদেশ পালন করিয়া চলিলে পৃথিবী হইতে যেমন রোগীর সংখ্যা হ্রাস পাইয়া থাকে, সেইরূপ অল্পায়ুর সংখ্যাও কমিয়া যায়। আমরা এ সকল উপদেশ পালন করিতে জানি না বলিয়াই তো এখন আমাদের এই দুর্গতির চরম অবস্থা! শুধু রোগ রোগ করিয়া চীৎকার করিলে চলিবে কেন, রোগ না হইবার যে সকল বিধি-ব্যবস্থা আর্য্য ঋষি দিয়া গিয়াছেন, তাহা অব্যাহত ভাবে পালন কর; দেখিবে, তোমার সংসারে রোগের প্রাদুর্ভাব সত্য সত্যই অনেক কম পড়িয়া গিয়াছে। ঋষি উপদেশ মানি না বলিয়াই আজ আমাদের এত দুঃখ। হিন্দুর ধর্ম্ম হিন্দুর স্বাস্থ্যের সহিত জড়িত—এ কথাটি আমরা যত দিন না বুঝিতে পারিব আর্য্যঋষির অমূল্য উপদেশাবলী যে পর্য্যন্ত না আমরা বর্ণে বর্ণে পালন করিতে শিখিব, সমগ্র চিকিৎসার মূল গ্রন্থ চরক ও সুশ্রুতকে যে পর্য্যন্ত না আমরা সমাদর করিয়া সর্ব্ব সময়ে বরণ করিতে না পারিব, সে পর্য্যন্ত যে আমাদের কল্যাণ নাই একথা বলিতে পারা যায়।

"যস্য দেশস্য যো জন্তু তজ্জং তদৌষধম হিতম্।"

এই প্রসঙ্গে একথাটিও আমাদের স্মরণ রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। ইহার অর্থ—যে দেশের প্রাণী, তাহার পক্ষে সেই দেশের ঔষধই হিতকর। আমরা যে কারণেই হউক—এ কথাটির মর্য্যাদা রক্ষা করিতে অধুনা প্রস্তুত নহি। আমরা জানি, ম্যালেরিয়া জ্বরে এলোপাথিক চিকিৎসা করাইলে শীঘ্র উপকার হইবে। কিন্তু সেই উপকারের পরিণতি যে কোথায়—তাহা তো আমরা ভাবিয়া দেখি না। ঋষি, বায়ুপিত্তকফের উপর নির্ভর করিয়া তাবৎ রোগেরই চিকিৎসা কর—উপদেশ দিয়াছেন। সেই প্রসঙ্গে উহাদিগের ভোগকালেরও যে নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন, প্রকৃত আরোগ্যকামী ব্যক্তির সেই ভোগকালের অপেক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বিদেরা সে ভোগ কালের যে অপেক্ষা করেন না, তাহার ফলে তাঁহাদের চিকিৎসায় আশু রোগের হস্ত হইতে মুক্ত হইলেও উহার দ্বারা অন্য ব্যাধি কর্ত্তৃক যে আক্রান্ত হইতে হয়—এ কথা শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে। আমরা এ সকল বিষয় ক্রমশঃ বুঝাইব।

ব্রহ্মচর্য্য।

[কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন]

যতগুলি কারণে বাঙ্গালীর দৈহিক অবঅবনতি ঘটিয়াছে, ব্রহ্মচর্য্যহীনতা তাহাদিগের অন্যতম। যে সময়ে বাঙ্গালী জাতি এই ব্রহ্মচর্য্য সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতে জানিত রাজ পুত্রই হউন, আর সামান্ত গৃহস্থের পুত্রই হউন, যে সময়ে বালক নির্ব্বিশেষে সকলকেই গুরুগৃহে পঠদ্দশা অতিবাহিত করিয়া উপযুক্ত বয়সে সংসার ধর্ম্মে প্রবেশ করিতে হইত, পঞ্চবিংশতি বর্ষের পূর্ব্বে পুরুষের এবং ষোড়শ বর্ষের পূর্ব্বে যখন স্ত্রী পুরুষের

মিলনের ব্যবস্থা ছিলনা, তখন বাঙ্গালী জাতি যে এত রোগপ্রবণ হইত না,—তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তখন বাল্য বিবাহ—বাঙ্গালী সমাজে প্রচলিত ছিল বটে কিন্তু যথাযোগ্য কাল উপস্থিত না হইলে স্ত্রী পুরুষের মিলিত হইবার উপায় ছিল না। বিবাহের উদ্দেশ্য—কাম প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি সম্পাদন নহে। স্বাস্থ্যবান ও দীর্ঘায়ু সন্তান লাভই যৌন সম্মিলনের উদ্দেশ্য বলিয়া তখনকার দিনে সকলে জানিত। এখন সে প্রথা যে দেশ হইতে লোপ পাইয়াছে, দেশের দুর্গতির তাহাই আমরা সর্ব্ব প্রধান কারণ বলিয়া মনে করি।

ব্রহ্মচর্য্য বলিলে থান কাপড় পড়িতে হইবে, আতপ চাউল খাইতে হইবে, মাছ মাংস ত্যাগ করিতে হইবে—এমন অর্থ করিলে চলিবে না। বীর্য্যরক্ষাই ব্রহ্মচর্য্য শব্দের প্রকৃত অর্থ। কিন্তু আমরা এ অর্থ ভুলিয়াছি। বিধবার সাদা কাপড় পড়েন, এক বেলা আতপায় ভোজন করেন—তাঁহাদিগকে নিরামিষ খাইতে হয়—সুতরাং তাঁহারাই প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া থাকেন—ইহাতেই আমরা স্থির করিয়া লইয়াছি ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইলে বুঝি ঐরূপ আচরণই করিতে হইবে। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য উহা নহে, বাহ্যিক এবং মানসিক—সর্ব্ব প্রকারে ইন্দ্রিয় সংযমের নামান্তরই হইল ব্রহ্মচর্য্য। অধুনা এ ব্রহ্মচর্য্য—দেশ হইতে লুপ্ত হইয়াছে বলিলে অন্যায় বলা হইবে না।

আগে পঠদ্দশায় গুরুগৃহে অবস্থিতির যেরূপ প্রথা ছিল, সেইরূপ শিক্ষণীয় বিষয় গুলিও ছিল ধর্ম্মমূলক। এখন সে গুরু গৃহও নাই সে ধর্ম্মমূলক শিক্ষারও ব্যবস্থা নাই। ফলে ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম হইতে না হইতেই সঙ্গদোষে অনেক বালকই অস্বাভাবিক উপায়ে শুক্র ব্যয়ে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। বাঙ্গালী বালকের স্বাস্থ্য এমনই করিয়া যে নষ্ট হইয়া পড়িতেছে, তাহার জন্য দেশের মনীষীরা চিন্তা করিতেছেন কি?

"মরণং বিন্দু পাতেন
জীবনং বিন্দু ধারণাৎ।"

বিন্দু অর্থাৎ শুক্রের ব্যয়ই মরণের কারণ এবং শুক্র সংরক্ষণই দীর্ঘায়ু লাভের প্রকৃষ্ট উপায়। বাঙ্গালী বালককে এ কথা শিখাইবে কে? যতদিন না লজ্জা ছাড়িয়া দেশের কোমলমতি বালকদিগকে এ কথা বুঝাইয়া দেওয়া হইবে—ততদিন যে আমাদের সমাজের মঙ্গল নাই—ইহা অবিসংবাদিত সত্য।

বহুকালাবধি চিকিৎসা ব্যবসায়ে ব্রতী থাকিয়া যতদূর বুঝিয়াছি—তাহাতে বাল্যের এইরূপ অযথা অত্যাচারের ফলেই বহু সংখ্যক বাঙ্গালীকে জীবন্মৃত করিয়া—তুলিয়াছে। ইহার পরিণতি বাঙ্গালীর অকাল মৃত্যু। কলিকাতায় যক্ষ্মা বা থাইসিসে যে বহু সংখ্যক ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকেন, কারণ অনুসন্ধান করিলে তাহার মূলে বাল্য জীবনে অস্বাভাবিক শুক্র ক্ষয় দেখিতে পাওয়া যাইবে। বাঙ্গালীর ম্যালেরিয়া—কালাজ্বরের মূলেও এই পাপ নিহিত। বাঙ্গালীর শিশু মৃত্যুর কারণেও আমরা এই শ্রেণীর অযথা শুক্রব্যয়ী পুরুষদিগকে দায়ী করিতে পারি।

শুক্রই মানবের প্রাণ, শুক্রই পুরুষের

পুরুষত্ব। ভুক্ত পদার্থের রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা এবং মজ্জা হইতে শুক্র জন্মিয়া থাকে। ইহারা শরীর ধারণের প্রধান উপকরণ বলিয়া ইহাদিগের নাম ধাতু। ইহাদিগের মধ্যে আবার শুক্রধাতু শরীর ধারণের পক্ষে কতটা উপযোগী, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। অস্বাভাবিক উপায়ে ইন্দ্রিয় পরিচালনার ফল মানুষের ধৃতি, স্মৃতি, শক্তি, সামর্থ্য, উৎসাহ, অধ্যবসায় সমস্তই লুপ্ত হইয়া মানুষকে অন্তঃসার শূন্য ও অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলে। এইরূপ অবস্থায় জীবনধারণ বিড়ম্বনা মাত্র। পক্ষান্তরে এইরূপ অত্যাচারী পুরুষেরা শুধু যে নিজেরাই সংসারের যাবতীয় সুখৈশ্বর্য্য বিসর্জ্জন দিয়া থাকে এমন নহে, তাহাদিগের সন্তান সন্ততিগণ পর্য্যন্ত তাহাদিগের অর্জ্জিত কষ্টের ফলভোগী হইয়া থাকে। এখনকার দিনে ডিস্‌পেপটিক বলিয়া যাঁহারা পরিচয় দিয়া থাকেন, তাঁহাদের আমূলস্ত ইতিহাসের পরিচয় লইলে তাহার মূলে অবৈধ উপায়ে শুক্রক্ষয়ই সর্ব্বপ্রধান কারণ জানিতে পারা যায়। সমাজ হইতে এই ঘোরতর সংক্রামক ব্যাধি যাহাতে সমূলে ধ্বংস হইতে পারে, তাহার উপায় বিধান করা প্রত্যেক সমাজ হিতৈষীর সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। এই সর্ব্বনাশকর ব্যাধি দূর করিতে হইলে দেশে আবার ব্রহ্মচর্য্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিতে হইবে, সেই গুরুগৃহে অবস্থিতি—সেই ধর্ম্মগ্রন্থের অনুশীলন—সেই সর্ব্বপ্রকারে চিত্ত সংযমের সুব্যবস্থা—সেই বিলাস-বাসনার লেশ মাত্রও যাহাতে উপস্থিত হইয়া ইন্দ্রিয় সকলকে বিপর্য্যস্ত করিয়া না তুলে—তাহার উপায় সর্ব্বতোভাবে করিতে হইবে। হিন্দুসমাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী পুরুষমণ্ডলী এই প্রধান প্রয়োজনীয় কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিবেন কি ?

প্রকৃত কথা, আমাদের দেশের অধিবাসীদিগকে আবার কর্ম্মী করিয়া তুলিবার আবশ্যক হইলে আবার যাহাতে ছাত্রজীবনে সেকালের মত ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা করিতেই হইবে। এই ব্রহ্মচর্য্যের শিক্ষা শুধু শারীরিক শাসন দ্বারা লাভ করা যায় না, মনের পবিত্রতাই ইহার প্রধান অবলম্বন। মনের পবিত্রতা ভিন্ন ইন্দ্রিয় সংযম হইতে পারে না। এই ইন্দ্রিয় সংযম করিবার অভ্যাস—ছাত্রজীবনে শিক্ষা করিলে, তবে বিবাহিত জীবনে উহা রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য্য পালন তত কঠিন নহে, কিন্তু বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্য্য পালন বড়ই কঠিন। বাল্যে সদুপদেশ না পাইলে যৌবনে ব্রহ্মচর্য্য পালন করা সম্ভবপর হইয়া উঠে না। যদি বাল্যে সুশিক্ষা পাইয়া বিবাহিত জীবনে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন, তাহা হইলে তাহার ফলে তিনি যে ভাবী সন্তানের কৃতজ্ঞতা ও সমাজের ধন্যবাদ ভাজন হইবেন তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

শুক্র ধারণই যখন ব্রহ্মচর্য্যের সর্ব্ব প্রধান বিষয়,তখন শুক্র জিনিসটা কি,—উহাদের স্থান কোথায় এবং উহার প্রকৃতি ও ক্রিয়া কি—সকলেরই জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

পুরুষের মুষ্ক বা কোষদ্বয় শুক্রোৎপত্তির স্থান। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে শুক্র পরীক্ষা করিলে ওজঃ পদার্থে বেঙ্গাচির আকৃতি বিশিষ্ট বহু সংখ্যক জীবাণু

পরিবেষ্টিত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা যে কেবল জীবনীশক্তি সম্পন্ন এমন নহে, অত্যন্ত বিচরণশীলতাও ইহাদের প্রকৃতির বিশেষত্ব। এই বিচরণশীলতারও আবার বিশেষত্ব যে, ইহারা রন্ধ্র পথেই প্রবেশ করিতে ভাল বসিয়া থাকে। এই বিশেষত্বের ফলেই ইহারা যোনিদ্বার দিয়া মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিয়া সন্তানের জীবাণু সঞ্চার করে। পঁচিশ বৎসরের বয়সের পূর্ব্বে পূর্ণ শক্তিশালী শুক্র উৎপন্ন হয় না বলিয়াই উহার পূর্ব্বে স্ত্রীলোকের সহিত সম্মিলিত হইতে আর্য্য ঋষি নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। পঁচিশ বৎসরের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত শরীরের গঠন ক্রিয়া—বিশেষত্ব অস্থি ও মস্তিষ্কের গঠন অতি ক্ষিপ্রতার সহিত সম্পন্ন হইতে থাকে। ঐ সময় রক্ত এই গঠন কার্য্যে অতিশয় ব্যস্ত থাকার জন্য জননেন্দ্রিয়ের দিকে মনোযোগ দিতে পারে না। পঁচিশ বৎসরের পরে শারীর গঠনের এই ক্ষিপ্রতা অপসারিত হয় এবং শরীরের অন্যত্র রক্তের প্রয়োজন অপেক্ষাকৃত কম হয় বলিয়া রক্ত যেন অবকাশ প্রাপ্ত হইয়া জননেন্দ্রিয়গুলির পুষ্টির প্রতি সমুচিত মনোযোগ দিতে সমর্থ হয়। ইহাই হইল প্রকৃতির বিচিত্র নিয়ম, কিন্তু অস্বাভাবিক উপায়ে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিলে চৌদ্দ বা পনের বৎসর বয়সেও যৌবনে পদার্পণ করিতে পারা যায়। এই অস্বাভাবিক উত্তেজনার ফলে ষোল বৎসরের বালকও সন্তানের পিতা হইতে পারে।

শুক্র-জীবাণুর সহিত ডিম্বাণুর সম্মিলনই সন্তানের জীবন প্রতিষ্ঠার কারণ। ডিম্বাণুর উৎপত্তি স্থান মাতৃগর্ভ, এই মাতৃগর্ভস্থ ডিম্বাণু হইতেই জীব শরীরের উৎপত্তি। এই ডিম্বাণুর জীবন অনেকটা উদ্ভিদ জীবনের অনুরূপ। এই ডিম্বাণুতে জীবন সঞ্চার করিতে বহু পরিমাণে শুক্র-জীবাণু প্রবেশের আবশ্যক। শুক্র-জীবাণুগুলি মাতৃগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া এই ডিম্বাণুর সহিত যখন মিলিত হয়, তখনই ডিম্বাণু—উদ্ভিদের প্রকৃতি পরিত্যাগ করিয়া জীবপ্রকৃতি অবলম্বন করে। সংক্ষেপে ইহাই হইল জীবসৃষ্টির অপূর্ব্ব রহস্য।

এই রহস্য অবগত হইলে সহজেই প্রমাণিত হইবে যে, অসময়ে এবং অস্বাভাবিক উপায়ে শুক্রব্যয়ের পরিণতি যেমন স্বকীয় স্বাস্থ্যহানি, সেইরূপ উহার ফলে অনেক শুক্র-জীবাণুরও ধ্বংস সাধন অনিবার্য্য। কিন্তু তাহা যখন স্থূলদৃষ্টির গোচরীভূত নহে, তখন সে কথা ছাড়িয়া দিলেও এই সংযমহীনতার ফলে ঘুণ ধরা বাঁশের মত বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ বংশধরগণ অকালমৃত্যুকে বরণ করিয়া আনিতেছে ইহা অবিসংবাদিত কথা, ইহার প্রতিকূলে বলিবার কিছুই নাই।

আসল কথা, ব্রহ্মচর্য্য ভুলিয়া বাঙ্গালী অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। এই অধঃপতিত জাতির পুনরায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে আবার তাহাকে ব্রহ্মচর্য্যের শিক্ষায় অভ্যস্ত হইতে হইবে। বাঙ্গালী-বালকই বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ বংশধর। সেই বংশধরদিগকে রক্ষা করিবার জন্য—বাঙ্গালীর সমাজকে আবার কর্ম্মীরূপে গড়িয়া তুলিবার জন্য—বাঙ্গালীর শরীরে আবার অদম্য শক্তি সঞ্চয়ের জন্য আবার বাঙ্গালীকে ইন্দ্রিয় সংযমের অপূর্ব্ব শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সেকালের মত গুরুগৃহের ব্যবস্থা করিতে না পার,

বাঙ্গালী কর্ম্মীপুরুষ! এমন বিদ্যালয়গুলির প্রতিষ্ঠা কর, যে বিদ্যালয়ে ত্যাগের শিক্ষা ও ভোগের বৈরাগ্য লাভ করিয়া জ্ঞানের উন্মেষ সহজেই হইতে পারে, যে বিদ্যালয়ে ধর্ম্মের সহিত স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ সুকুমার মতি বয়সেই উপলব্ধি করিয়া প্রকৃত কর্ম্মী হইতে পারা যায়। এইরূপভাবে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদত্ত হইলে বাঙ্গালী-বালককে আর ব্রহ্মচর্য্যের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষাদানের আবশ্যক হইবে না, তাহার পরিণত বয়সে তাহাকে অনাঘ্রাত কুসুম বিবেচনা করিয়া তাহার অভিভাবকগণ তাহাকে দেবীর অর্ঘ্য প্রদানে হৃষ্টমনা হইতে পারিবেন।

গর্ভাবস্থায় চিকিৎসা।

(কবিরাজ শ্রীরাখাল দাস সেনগুপ্ত কাব্যতীর্থ)

—:•:—

প্রথম মাসে—যদি গর্ভিণীর রক্তস্রাব হইতে থাকে, তাহা হইলে, যষ্টিমধু, শাক বীজ, ক্ষীরকাকোলী ও দেবদারু—এই সকল দ্রব্যের কাথের সহিত দুগ্ধ মিশাইয়া খাইতে দিবে।

দ্বিতীয় মাসে,—রক্তস্রাব হইলে আমরুল, কৃষ্ণতিল, মঞ্জিষ্ঠা ও শতমূলী, এই এই সকল দ্রব্যের কাথ—দুগ্ধ সহ খাইতে দিবে।

তৃতীয় মাসে,—রক্তস্রাব হইলে অনন্তমূল, শ্যামালতা, রাস্না, বামুনহাটী ও যষ্টিমধুর কাথের সহিত দুগ্ধ মিশাইয়া খাইতে দিবে।

পঞ্চম মাসে—রক্তস্রাব হইলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গাম্ভারীফল, বটাদি ক্ষীর বৃক্ষের বল্কল ও শুঙ্গ, এই সকল দ্রব্যের কাথ দুগ্ধসহ পান করিতে দিবে।

ষষ্ঠমাসে,—রক্তস্রাব হইলে, চাকুলে, বেড়েলা, সজিনাবীজ, গোক্ষুর. যষ্টীমধু—ইহাদের কাথ, দুগ্ধসহ পান করিতে দিবে।

সপ্তম মাসে,—রক্তস্রাব হইলে, পাণিফল, মৃণাল, কিসমিস, কেশুর ও যষ্টিমধু —এই সকল দ্রব্যের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া খাইতে দিবে।

অষ্টম মাসে,—রক্তস্রাব হইলে, কয়েদ বেল, বেল, বৃহতী, ইক্ষু ও কণ্টকারী —ইহাদের মূল এবং পলতা, এক পোয়া দুগ্ধ ও এক সের জলসহ পাক করিয়া একপোয়া থাকিতে নামাইয়া পান করিতে দিবে।

নবম মাসে,—রক্তস্রাব হইলে, অনন্তমূল, যষ্টিমধু, ক্ষীর কাকোলী ও শ্যামালতা —এই সকল দ্রব্য পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দুগ্ধসহ—পাক করিয়া সেই দুগ্ধপান করিতে দিবে।

দশম মাসে,—রক্তস্রাব হইলে,

শুঠীসহ—পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দুগ্ধ পাক করিয়া খাইতে দিবে অথবা শুঁঠ, যষ্টিমধু ও দেবদারুর সহিত পূর্ব্ববৎ দুগ্ধ পাক করিয়া খাইতে দিবে।

উপরি উক্ত পাচন গুলি প্রস্তুতের নিয়ম পাচনগুলির মিলিত পরিমাণ দুই তোলা, জল অর্দ্ধ সের। শেষ অর্দ্ধ পোয়া।

গর্ভ বেদনারপ্রতীকার।

প্রথম মাসে,—যদি গর্ভিণীর বেদনা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, শ্বেত চন্দন, শুলফা, চিনি ও ময়না ফল সমপরিমাণে, চাউল ধোয়া জলে বাটিয়া দুগ্ধসহ পান করিতে দিবে। অথবা তিল, পদ্মকাষ্ঠ শালুক ও শালিতণ্ডুল দুগ্ধসহ পেষণ করিয়া চিনি, মধু ও দুগ্ধসহ পান করিতে দিবে এবং ঔষধ জীর্ণ হইলে দুগ্ধান্ন পথ্য দিবে।

দ্বিতীয় মাসে,—পদ্ম, পাণিফল ও কেশুর,—চাউল ধোয়া জলে বাটিয়া পান করিতে দিবে।

তৃতীয় মাসে,—গর্ভ বেদনায়—ক্ষীর কাকোলী, কাকোলী ও আমলকী, পেষণ করিয়া উষ্ণ জলের সহিত পান করিতে দিবে। অথবা পদ্ম নীলোৎপল, কুড় ও শালুক সম পরিমাণে চিনির জলে বাটিয়া খাইতে দিবে। পথ্য—দুগ্ধান্ন।

চতুর্থ মাসে,—গর্ভ বেদনায়, উৎপল, শালুক, কণ্টকারী, গোক্ষুর অথবা গোক্ষুর, কণ্টকারী, বালা ও নীলোৎপল দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া পান করিতে দিবে।

পঞ্চম মাসে,—গর্ভ বেদনায় নীলোৎপল ও ক্ষীর কাকোলী দুগ্ধে পেষণ করিয়া দুগ্ধ, ঘৃত ও মধুসহ—অথবা নীলোৎপল, ঘৃতকুমারী ও কাকোলী সম পরিমাণে পেষণ করিয়া শীতল জলসহ পান করিতে দিবে।

ষষ্ঠ মাসে,—গর্ভ বেদনায়, টাবা লেবুর বীজ, প্রিয়ঙ্গু, চন্দন ও উৎপল, দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া অথবা পিয়াল বীজ, দ্রাক্ষা ও খৈচূর্ণ, শীতল জলের সহিত পেষণ করিয়া খাইতে দিবে।

সপ্তম মাসে,—গর্ভ বেদনায়, শতমূলী ও পদ্মমূল বাটিয়া দুগ্ধসহ অথবা কয়েদ বেল, সুপারি মূল, খৈ ও চিনি—শীতল জলে বাটিয়া দুগ্ধসহ পান করিতে দিবে।

অষ্টম মাসে,—গর্ভ বেদনায় ধনে বাটিয়া চাউল ধোয়া জলের সহিত অথবা পলাশ পত্র শীতল জলে বাটিয়া পান করিতে দিবে।

নবম মাসে,—গর্ভ বেদনায়, এরণ্ড মূল ও কাকোলী, শীতল জলে বাটিয়া অথবা পলাশ বীজ, কাকোলী ও ঝাঁটিমূল, কাঁজির সহিত বাটিয়া খাইতে দিবে।

দশম মাসে,—গর্ভ বেদনায়, নীলোৎপল, যষ্টিমধু, মুগ ও চিনি—জলে বাটিয়া দুগ্ধসহ পান করিতে দিবে।

গর্ভিণীর জ্বর চিকিৎসা।

গর্ভিণীর জ্বর বা অন্য কোনো প্রকার ব্যাধি উপস্থিত হইলে, বিশেষ বিবেচনার সহিত চিকিৎসা করা উচিত। যাহাতে গর্ভের কোনোরূপ বাধা না জন্মায়, তাদৃশ মৃদু, মধুর, শিশির, সুখসেব্য, সুকুমারপ্রায় ঔষধ ও

অন্ন পানাদির ব্যবস্থা করিবে। বমন, বিরেচন ও শিরো বিরেচন কদাচ প্রয়োগ করিবে না।

গর্ভিণীর জ্বর নিবারণের জন্য যে সকল ঔষধের ব্যবস্থা এখানে লিখিত হইতেছে, সে সকল নিঃশঙ্ক চিত্তে ব্যবহার করিতে পারা যায়, ইহাদের দ্বারা গর্ভিণীর কোনো প্রকার আশঙ্কা নাই।

যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, বেণার মূল, অনন্ত মূল, পদ্মকাষ্ঠ—এই সকল দ্রব্য মোট দুই তোলা পরিমাণে লইয়া আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া চিনি ও মধু সহ পান করিতে দিবে। ইহার দ্বারা গর্ভিণীর জ্বর শান্তি হয়।

রক্ত চন্দন, অনন্তমূল, লোধ ও দ্রাক্ষা—ইহাদের মিলিত ওজন দুই তোলা অর্থাৎ প্রত্যেক দ্রব্যটি আধতোলা পরিমাণে লইয়া আধ সের জলে সিদ্ধ করিবে। শেষ আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। ঐ ক্বাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে গর্ভিণীর জ্বর ভাল হইবে।

অতিসার চিকিৎসা।

১। শুঁঠ, আতইচ, মুতা অথবা ধনে ও শুঁঠ মিলিত দুই তোলা, আধসের জলে পাক করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া পান করিতে দিবে। ইহা দ্বারা প্রবল অতিসার ও তৃষ্ণা, শূল প্রভৃতি উপসর্গ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ইহা পাচক, অগ্নি উদ্দীপক ও লঘু।

২। শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারীও গোক্ষুর, বেড়েলা মূল, শুঁঠ, ধনে, নীলোৎপল ও বেল-শুঁঠ—ইহাদের মিলিত ওজন দুই তোলা, জল একসের ও তক্র এক পোয়া পরিমাণে দিয়া পাক করিয়া এবং এক পোয়া থাকিতে নামাইয়া ঐ ক্বাথ পান করিতে দিবে। ইহার দ্বারা বাত-প্রধান অতিসারের শান্তি হয়।

৩। কঙ্কটক (কাঁচড়া পাতা), জামপাতা, দাড়িমপাতা, পাণিফল পাতা, বেলশুঁঠ, বালা, মুতা ও শুঁঠ—প্রত্যেকটি চারি আনা পরিমাণে লইয়া যথারীতি ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিতে দিবে। ইহার ক্বাথে প্রবল অতিসারের শান্তি হইয়া থাকে।

৪। ইন্দ্রযব, দাড়িম ছাল, আকনাদি, বেলশুঁঠ এবং আম অথবা জামের কচিপাতা—ইহাদের মধ্যে যাহা সংগ্রহ করিতে পারা যায়, বাটিয়া, দধি ও চিনির সহিত, খাইলে গর্ভিণীর অতিসার ভাল হয়।

গ্রহণী চিকিৎসা।

আমছাল ও জামছালের ক্বাথে খৈ চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া লেহন করিলে অতি সত্বর গর্ভিণীর গ্রহণী নিবারিত হয়।

শ্বাস কাসাদি চিকিৎসা। দারুচিনি চূর্ণ এক ভাগ, বড় এলাইচ চূর্ণ দুই ভাগ। পিপুল চূর্ণ চারি ভাগ, বংশলোচন আট ভাগ—এবং চিনি ষোল ভাগ—একত্র মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। এই চূর্ণ ঘৃত ও মধুর সহিত মিশাইয়া লেহন করিলে শ্বাস, কাস, অরুচি, মন্দাগ্নি প্রভৃতির শান্তির হইয়া থাকে।

রোগতত্ত্ব।

(কবিরাজ শ্রীদীননাথ কবিরত্ন শাস্ত্রী)

—:*:—

"তদ্দুঃখ সংযোগা ব্যাধয় ইতি"—সুশ্রুত।

"বিকারো ধাতু বৈষম্যং, বিকারো
দুঃখ মেবচ"—চরক।

রোগ কি ? ইহার স্থূল জ্ঞান প্রায় সকলের মনে নিহিত আছে। কেননা প্রায় সকল রোগেই কোন না কোন যাতনা অনুভূত হয়। রোগ উপস্থিত হইয়াছে অথচ যন্ত্রণা বোধ নাই, এরূপ স্থল অতি বিরল। কখনও কোনো রোগ ভোগ করেন নাই—এরূপ লোকের সংখ্যাও অত্যধিক অল্প। সুতরাং রোগ বলিলেই প্রধানতঃ আমাদের প্রতীতি হয় যে, কোন প্রকার যাতনা উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু এতাদৃশ জ্ঞান সাধারণতঃ অনুভূতি মাত্র। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা দ্বারা কোন রোগেরই যথার্থ তত্ত্ব নিরূপিত হয় না। যেহেতু জ্বরের যেরূপ আকার, উদরাময়ের সেরূপ আকার নয়। উদরাময়ের যেরূপ আকার, অর্শোরোগের সেরূপ আকার নয়। এক রোগও নানা আকার ধারণ করে। অনেক রোগও এক প্রকার আকারে আবির্ভূত হয়। কতকগুলি রোগের আকার আবার সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় না। এই সকল কারণে রোগ নির্ণয় এত দুরূহ ব্যাপার। এই হেতুবাদ নিবন্ধন চিকিৎসা শাস্ত্রেও অনেক মতভেদ লক্ষিত হয়।

পরন্তু রোগের আকৃতিগত পার্থক্যাদি থাকিলেও এমন অনেকগুলি ধর্ম্ম আছে, সেগুলি প্রায়শঃ সকল রোগেই বিদ্যমান থাকে। সেই ধর্ম্মগুলিকে সাধারণ ধর্ম্ম বলিয়াই ঋষিগণ সমুদয় রোগের ব্যাপক লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রস্তাবের শিরোদেশে যে সূত্র দুইটি বিন্যস্ত হইল, সেগুলি রোগের সাধারণ স্বরূপ বোধক। অথবা রোগের সাধারণ ধর্ম্ম বা লক্ষণজ্ঞাপক। উহাদিগের ব্যাখ্যা সুচারুরূপে হৃদয়ঙ্গম করিলে আমরা ঋষিদিগের গূঢ় অভিপ্রায় বুঝিতে সমর্থ হইব। উক্ত সূত্র দুইটীর অর্থ এই যে যাহা দ্বারা পুরুষের ব্যক্তিগত দুঃখ উপস্থিত হয়, তাহাকেই রোগ বলে! সুতরাং দুঃখজনক মাত্রেই রোগ বলিয়া গণ্য। কথাটি সংক্ষিপ্ত হইলেও ইহার অর্থ বহুদূর বিসর্গী, এমন কি অধ্যাত্ম প্রকরণ পর্য্যন্ত ইহার স্পর্শের আয়ত্ত। কেননা জরা, মৃত্যু, শোক, তাপ প্রভৃতি দেহের স্বাভাবিক সমগ্র ব্যাপারই রোগের অন্তর্ভূত। যেহেতু ইহা-দ্বারা পুরুষের যে দুঃখ উপস্থিত হয়, সে দুঃখের অভিঘাতে পুরুষ সর্ব্বদাই জর্জ্জরিত, সর্ব্বদাই ব্যাকুল। অধ্যাত্ম পণ্ডিতগণ ইহা-দিগের নিকট জ্বর প্রভৃতি রোগ সমূহকে অতি সামান্যই মনে করেন। তাঁহারা বলেন, জ্বরাদি রোগ লৌকিক চেষ্টাতেই প্রশমিত হইতে পারে; কিন্তু জরা, মৃত্যু, শোক, তাপ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি স্বাভাবিক রোগ সকল

সামান্ত চেষ্টার আয়ত্ত নহে। তুমি যত বড় পণ্ডিত— যত বড় বুদ্ধিমান, যত বড় চেষ্টাশীল হওনা কেন, স্বাভাবিক রোগের হস্ত হইতে কিছুতেই তোমার নিষ্কৃতি নাই। শৈশবের পশ্চাদ্‌গামিনী জরা তোমাকে আক্রমণ করিবেই করিবে। জীবনের সহচর মৃত্যু নিশ্চয়ই তোমাকে গ্রাস করিবে। প্রকৃতির এই সকল স্বাভাবিক নিয়ম কর্ম্মময় জীবনে মানবের অলঙ্ঘনীয়। যাহা হউক পূর্ব্বোল্লিখিত সূত্রদ্বয়ের দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে,—মানবের যে কোনরূপ দুঃখপ্রদ অবস্থা বিশেষ উপস্থিত হইলেই, ঋষিগণ তাহাকে ব্যাধি সংজ্ঞায় অভিহিত করিতেন। কিন্তু আমরা সংসারী বিষয়ী, ঐহিক সুখই আমাদিগের সর্ব্বস্ব। ঋষিগণের নিকট সংসার বিষময় হইলেও আমাদিগের পক্ষে ইহা সুখের প্রস্রবণ। ক্ষুধা-তৃষ্ণা তাঁহাদিগের বৈরাগ্য বুদ্ধিতে রোগ বলিয়া গণ্য হইলেও আমাদিগের নিকট সর্ব্বথা প্রার্থনীয় সুখ। সুতরাং ততদূর ব্যাপক লক্ষণ আমাদিগের মনঃপূত হয় না। তাই আমরা আর একটী সূত্র প্রথমোক্ত সূত্রদ্বয়ের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিতেছি। উহার অর্থ এই যে,—ধাতুগণের বৈষম্যই রোগ*। শরীরের বিধান, ধারণ বা পোষণের উপযুক্ত পদার্থ মাত্রেই ধাতু। সুতরাং শরীরের উপাদানে জীবক সমুদয় দ্রব্যকেই রস, রক্ত প্রভৃতি পদার্থ এবং যকৃত প্লীহাদি অস্ত্র মাত্রকেই ধাতু বলা যায়। তাহাদের কোন বৈষম্য বা অন্যথা ভাব ঘটিলেই রোগ বলা যাইতে পারে। জীবিত শরীরে যে সকল অস্ত্র যে ভাবে থাকিয়া যেরূপ কাজ করিতেছে এবং যে যে পদার্থে যে পরিমাণে ও যে ভাবে থাকা আবশ্যক তাহার বিকৃতিকেই রোগ বলে।

বৈষম্য শব্দে উল্লিখিত পদার্থ সকলের দ্রব্যগত, গুণগত ও ক্রিয়াগত হ্রাস অথবা বৃদ্ধি এবং অস্ত্রাদির নির্ম্মাণগত অন্যথা ভাব বুঝিতে হইবে। কাহারও কাহারও মতে অন্যথাভাব চারি প্রকার। ১ম প্রকোপ, ২য় আশয়াপকর্ষ কোন তরল অথবা লঘু পদার্থ অর্থাৎ শরীর গত বায়ু, পিত্ত, কফ, রস, রক্ত প্রভৃতি পদার্থের—কোন বলবান অন্য ধাতুর আকর্ষণে স্বকীয় আশয় পরিত্যাগ করিয়া বিকৃত ভাবে অন্য আশয়ে গমন করাকে বুঝিতে হইবে। হীনতা শব্দের দ্রব্যগত হ্রাস এবং বৃদ্ধি শব্দে দ্রব্যগত পরিমাণ আধিক্য।

আপাততঃ বোধ হইতে পারে যে, উল্লিখিত লক্ষণ দ্বারা শারীরিক রোগের কিঞ্চিৎ আভাষ মাত্র পাওয়া গেল। কিন্তু মানসিক রোগের বিষয় অস্পষ্ট রহিল। শারীরধাতুর বৈষম্য বশতঃ যেরূপ জ্বর প্রভৃতি জন্মে, মানস ধাতুর বৈষম্য বশতঃ সেরূপ মূর্চ্ছা, কাম, ক্রোধাদি মনোবিকার উপস্থিত হইয়া থাকে। শারীর রোগের চিকিৎসা করাও আয়ুর্ব্বেদের যেরূপ একটী লক্ষ্য, মানস রোগের চিকিৎসা করাও আর একটী লক্ষ্য। সুতরাং মানসিক রোগের বিষয়েও এস্থলে স্থূলতঃ জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। পরন্তু ধাতু শব্দের আর একটী অর্থের প্রতি অভিনিবেশ করিলেই মানসিক রোগের স্বরূপতঃ সামান্য আকার জ্ঞান উপলব্ধি করা

* শারীরং দধাতি বিধত্তে ধারয়তি পুষ্ণাতি বা ইতি ধাতুঃ।

যাইতে পারে।—ধাতু শব্দে যেমন শারীরিক ধাতু রস, প্রভৃতি বুঝায়, তেমনি মানসিক ধাতু বলিলে সত্ত্বগুণ প্রভৃতি বুঝাইয়া থাকে। এই সত্ত্বগুণ প্রভৃতির বৈষম্য বশতঃ উন্মাদাদি মনোবিকার উপস্থিত হয়। সুতরাং ধাতু-বৈষম্য বলিলে শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ রোগেরই লক্ষণ যুগপৎ আসিয়া হৃদয় অধিকার করিয়া বসে।

উক্ত কথা গুলির বিবৃতি এই—আমাদিগের শরীরে আমাশয়ে (যে অন্ত্রে আহারীয় দ্রব্য প্রথমে উপস্থিত হয়) পক্বাশয়ে (ভুক্তদ্রব্যের অসার অংশগুলি যে অন্ত্রে মূত্র ও মলরূপে পরিণত হয়), রক্তশিরা প্রভৃতি অন্ত্র সকল নিয়ত আপন আপন কাজ করিতেছে। আহারীয় দ্রব্য হইতে রস, তাহা হইতে রক্ত এবং রক্ত হইতে মাংসাদি উৎপন্ন হইয়া শারীরিক পদার্থ সকলের ক্ষতিপূরণ ও পুষ্টি-সাধন করিতেছে। বাত, পিত্ত, কফ এই ত্রিবিধ শারীর পদার্থ এবং সত্ত্ব রজঃ তমঃ আপন আপন শিরা ধমনীপথে গতায়াত করিয়া জীবন ক্রিয়ার সহায়তা করিতেছে। এই নিমিত্ত আমরা স্বচ্ছন্দ শরীরে ও সুস্থ মনে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি, শৈশব হইতে বাল্যে, বাল্য হইতে যৌবনে, যৌবন হইতে প্রৌঢ় এবং প্রৌঢ়তা হইতেই বার্দ্ধক্যে উপনীত হইতেছি। এ সকল পদার্থের ও এ সকল কর্ম্মের কোনরূপ অন্যথা ভাব ঘটিলেই আমরা পীড়িত বা রোগগ্রস্ত বলিয়া গণ্য হই। জগতে বাহ্য পদার্থের সহিত আমাদিগের শরীর ও মনের নিয়ত সম্বন্ধ রহিয়াছে।

জল, বায়ু, সূর্য্যকিরণ প্রভৃতি প্রাকৃতিক পদার্থ, আহার-বিহার-শয়ন উপবেশন প্রভৃতি দৈহিক ব্যাপার, বাগবিতণ্ডা প্রভৃতি বাচনিক কার্য্য, কাম-ক্রোধাদি মানসিক উত্তেজনা, অথবা চিন্তন, অনুধ্যান প্রভৃতি মনোবৃত্তি নিষ্ঠ কর্ম্মের আমাদিগের আত্মা মনের সহিত ওতোপ্রোত ভাবে সম্বন্ধ রহিয়াছে। ঐ সকল দ্রব্যের ব্যবহার ও ঘটনার অনুষ্ঠান বিবিধ কারণে প্রয়োজন মত হইয়া উঠে না। কখনও প্রয়োজনাতিরিক্ত কখনও বা প্রয়োজন অপেক্ষা ন্যূন হইয়া থাকে। ঈদৃশ হেতু বশতঃই আমাদিগের জীবিত শরীরে প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও ঘটনাগুলির অন্যথাভাব ঘটিয়া তাহা রোগ নামে আখ্যাত হয়। বিষমতা প্রাপ্ত বাত পিত্তাদি হইতেও কতকগুলি রোগের উৎপত্তি হয়। ঐ রোগগুলিকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা—অমিশ্র ও মিশ্র। বাতের প্রকোপাদি জন্য যে রোগ উৎপন্ন হয় তাহাদিগকে বাতজন্য অমিশ্র রোগ বলা যায়। পিত্তের প্রকোপাদি জন্য যে রোগ জন্মে তাহাদিগকে পিত্ত জন্য অমিশ্ররোগ, শ্লেষ্মার প্রকোপাদি বশতঃ উৎপন্ন রোগগুলি শ্লেষ্মা জন্য অবিমিশ্র রোগ বলিয়া আখ্যাত হইতে পারে। আয়ুর্ব্বেদ পণ্ডিতরা স্থির করিয়াছেন যে, বাত জন্য নখ ভেদ (কোন স্থানে বিদারণ করিলে যেরূপ বেদনা অনুভব হয় সেইরূপ বেদনা) পাদশূল (গোড়ালির নিম্নদেশে বেদনা প্রভৃতি আশী প্রকার এবং পিত্ত জন্য দোষ (পার্শ্বে অগ্নি থাকিলে যেরূপ তাপ অনুভব হয় সেইরূপ অনুভব) প্রোষ (কিঞ্চিদ্দগ্ধ করিলে যেরূপ ক্লেশ অনুভব হয় সেরূপ

* ধাতবো বাতাদয়ো রসাদ যশ্চ তথা রজঃ প্রভৃতয়ঃ। চক্রপাণি।

অনুভব) প্রভৃতি ৪০ (চল্লিশ) প্রকার। ও শ্লেষ্ম জন্ত তৃপ্তি (সর্ব্বদা ক্ষুধা ও আহার প্রবৃত্তির অভাব বোধ) তন্দ্রা, গুরুতা প্রভৃতি কুড়ি প্রকার অবিমিশ্র রোগ বলা যায়। এই রোগগুলির কোনটি বাত জন্ত, কোন পিত্ত জন্ত ও কোনটী শ্লেষ্ম জন্ত, তাহা বহুকালে বহু পরীক্ষার দ্বারা স্থিরিকৃত হইয়াছে। অবিমিশ্র রোগগুলির মিশ্রনে অপর কতকগুলি রোগ উৎপন্ন হয়। উহাদিগকে মিশ্র রোগ বলা যাইতে পারে। যথা জ্বর, গ্রহণী, অতিসার, অর্শঃ প্রভৃতি যে সময়ে বাত পিত্তাদির বিষমতা হইতে জন্মিয়া থাকে, সেই সময়েই ঐ বাতদির বৈষম্য হইতে কম্প, দাহ, গাত্র গৌরব প্রভৃতি অপর কতকগুলি অবিমিশ্র রোগ উৎপন্ন হইয়া জ্বর প্রভৃতি রোগের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে ইহা স্থির কথা। শেষোক্ত রোগগুলিকে প্রথমোক্ত রোগের লিঙ্গ অর্থাৎ চিহ্ন বলে।

জ্বর অতিসার প্রভৃতি রোগ সকল উৎপন্ন হইবার পর রোগীর অত্যাচার বা অন্ত কোন কারণ প্রযুক্ত বাতপিত্তাদি প্রকোপের আধিক্য হওয়ার অপর কতকগুলি অমিশ্র রোগের উদ্ভব হয় ও উহারা প্রথমোক্ত রোগের সহিত মিলিত হইয়া যায়। শেষোক্ত রোগ গুলিকে প্রথমোক্ত রোগের উপদ্রব বলে। কোন্ কোন্ রোগের সহিত কোন্ কোন্ রোগের উপদ্রব ঘটিয়া থাকে—আয়ুর্ব্বেদিক পণ্ডিতরা তাহা এক প্রকার নিরূপিত করিয়া গিয়াছেন। অপর এক শ্রেণী রোগ আছে, তাহাতে প্রথমে বাত, পিত্ত বা কফের প্রকোপাদি হয় না অথচ অন্তরূপে ধাতু বৈষম্য ঘটে।* পশ্চাৎ বাতাদি প্রকোপাদি উপস্থিত হয়। অনন্তর বেদানাদাহ প্রভৃতি অবিমিশ্র রোগ, তদনন্তর ব্রণ প্রভৃতি মিশ্র রোগ আবির্ভূত হয়। ইহাদিগকে আগন্তুক রোগ বলে। তরবারী দ্বারা কোন ব্যক্তির শিরচ্ছেদ করিলেই তৎক্ষণাৎ তাহার অঙ্গ হানিরূপ ধাতু বৈষম্য ঘটিল। পরক্ষণেই আঘাত জন্ত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বাত প্রকোপ এবং পরম্পরা সম্বন্ধে পিত্তাদির প্রকোপ। অনন্তর বেদনাদাহ প্রভৃতি ব্রণ ক্ষত [illegible] রোগ ঘটিয়া থাকে। মানব শরীরে রোগের সংখ্যা কত তাহা স্থির করা [illegible] ও শক্তিসাধ্য নহে। রোগ অসংখ্য হইলেও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে তাহার কতগুলি পরিগণন [illegible] নির্দ্দেশ করিয়া আমরা নিম্নে তাহারই [illegible] উল্লেখ করিতেছি।

প্রথমতঃ যাবতীয় রোগকে ৩ ভাগে বিভক্ত করা যায়। ১ম আধ্যাত্মিক, ২য়

জ্ঞানার্থং যানি চোক্তানি ব্যাধি
লিঙ্গানি সংগ্রহে।
ব্যাধ্যয়স্তে তদাত্মেতু লিঙ্গানীমানি
নাময়া ॥ চরক।

* ঔপসর্গিকো নাম যঃ পূর্ব্বোৎপন্ন ব্যাধিং জঘন্ন কাল যাতো ব্যাধি রূপস্থজতি, শতমূল এব উপদ্রবসংজ্ঞঃ। সুশ্রুত।

স্বধাতু ধাতু বৈষম্য নিমিত্ত বিকার সন্ধ বহবঃ শরীরে নতে পৃথক্ পিত্ত কফানি লেভা আগন্তবস্তেতু ততো বিশিষ্টাঃ ॥ আগন্ত রন্বেতি নিজং বিকারং নিজ স্তথাগন্তমতি প্রবৃদ্ধঃ (চরক)। তে পূর্ব্বং কেবলাঃ পশ্চাৎ নিজৈর্ব্যামিশ্র লক্ষণা, হেত্বৌষধি বিশিষ্টাশ্চ ভবন্ত্যাগন্তবো জ্বরাঃ। চরক

আধিভৌতিক, ৩য় আধিদৈবিক, এস্থলে আত্মা বলিতে মন ও শরীর উভয়কেই এক সঙ্গে বুঝিতে হইবে। ভূত শব্দে অস্ত্র শস্ত্র প্রভৃতি বাহ্য পদার্থ, দেব শব্দে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ প্রভৃতি এবং গ্রীষ্ম বর্ষাদি ঋতু,রূপ, কাল ঘটিত প্রাকৃত নিয়ম। আত্মা অর্থাৎ মন ও শরীর ঘটিত যে সকল রোগ আহার বিহারাদির অনিয়ম জন্য উৎপন্ন হয়—তাহার নাম আধ্যাত্মিক। ভূত পদার্থ হইতে যে সকল রোগ জন্মে তাহাদিগের নাম আধিভৌতিক। দেব হইতে যে সকল রোগ জন্মে তাহাদিগের নাম আধিদৈবিক। আধ্যাত্মিক আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত,১ম আদিবলপ্রবৃত্ত, ২য় জন্মবল প্রবৃত্ত,৩য় দোষবল-প্রবৃত্ত। মানব শরীরে আদি উপাদান স্বরূপ শুক্র শোণিত বিকৃত থাকিলে তদুৎপন্ন শরীরে তজ্জন্য যে সকল রোগ জন্মে তাহাদিগের নাম আদিবল প্রবৃত্ত। যথা জাত কুষ্ঠ, সহজাত অর্শঃ, সহজাত প্রমেহ প্রভৃতি। আদিবলপ্রবৃত্ত রোগ আবর দুই প্রকার, প্রথমতঃ মাতৃজাত, দ্বিতীয়তঃ পিতৃজাত। মাতৃ শরীরের রজো বিকৃতিতে সন্তানের যে রোগ জন্মে, তাহার নাম মাতৃজাত। পিতার শুক্র দোষ জন্য সন্তানের যে রোগ জন্মে তাহার নাম পিতৃজাত। অবিকৃত শুক্র শোণিত হইতে মানবদেহের অঙ্কুরোৎপত্তি হইবার পর মাতৃ গর্ভস্থ তাহার অঙ্কুরের পরিপোষণ কালে গর্ভস্থ শিশুর যে রোগ জন্মে তাহার নাম জন্মবল প্রবৃত্ত। জন্মবল প্রবৃত্ত রোগও দুই প্রকার, ১ম রস কৃত, ২য় দৌহৃদাপচার কৃত। জরায়ুস্থিত সন্তান মাতৃ শরীরে আহার জনিত রস ধাতুর দ্বারা জীবিত থাকে এবং পরিপুষ্ট হয়। যদি তদবস্থায় মাতার আহার বিহারাদির অত্যাচার ঘটে,তাহা হইলে রস ধাতুর বিকৃতি জন্মে। তাদৃশ বিকৃত রসের দ্বারা পরিপোষিত হইয়া উদরস্থিত সন্তানের রোগ জন্মিয়া থাকে। ঐ রোগকে রসকৃত রোগ বলে, যথা সন্তানের অতি ক্ষীণতা প্রভৃতি। গর্ভ ৪র্থ মাসে উপনীত হইলে জরায়ুস্থ সন্তানের হৃদয়দেশের গঠন সম্পন্ন হয় এবং চেতনা ধাতু ব্যক্ত হইয়া উঠে। তখনই সন্তানের আহারের প্রবৃত্তি উপস্থিত হয়, ঐ প্রবৃত্তি গর্ভিণীর মনোরথের দ্বারা প্রকাশ পায়। এইরূপে একাধারে ২টী হৃদয়ের অবস্থা প্রযুক্ত ঐ সময় গর্ভিণীকে দ্বি হৃদয়া এবং গর্ভবতীর ঐরূপ আহারাদির অভিলাসকে দৌহৃদ বলে। ঐ দৌহৃদের পুরণ না হইলে ক্ষোভ বশতঃ গর্ভিণীর বাত প্রকোপ হয়। তজ্জন্য জরায়ুস্থ সন্তান কুব্জ, পঙ্গু, মূক (বোবা) ইত্যাদি বিকৃতাবস্থাপন্ন হইয়া থাকে। এইরূপ রোগকে দৌহৃদাপচারজনিত ব্যাধি বলে। *

---

* মাতুস্থ খলু রস বহায়াং নাড্যাং গর্ভবহা নাড়ী প্রতিবদ্ধাসাস্তামাতুরাহার রসবীর্য্য মভি ভবতে। তেনোপ স্নেহে নাস্তাপ বৃদ্ধির্ভবতি। সুশ্রুত।

সুশ্রুতের মতে ৪র্থ মাসে এবং চরকের মতে ৩য় মাসে দৌহৃদ উপস্থিত হয়।

দ্বিহৃদয়াত্মনারীং দৌহৃদিনীমাচক্ষতে।
সুশ্রুত।

গর্ভোবাত প্রকোপেণ দৌহৃদেচাবমানিতে
ভবেৎ কুব্জঃ কুনিঃ পঙ্গু মূর্ক মিন্ মিন এচ।
সুশ্রুত।

শরীরস্থ বায়ু পিত্ত এবং কফ এবং মানসিক রজঃ, তম এই পাচটীকে বিকৃত অবস্থার দোষ বলে। *

এই দোষদিগের প্রবলতা প্রযুক্ত যে সকল রোগ জন্মে তাহাদের দোষবল প্রবৃত্ত রোগ বলে। যথা জ্বর, অতিসার, উন্মাদ ইত্যাদি। ঐ সকল দোষবল প্রবৃত্ত রোগ ২টী শ্রেণীতে পরিগণিত। ১ম শারীর, ২য় মানস। যে রোগ মনকে আক্রমণ না করিয়া শরীরকে অধিক মাত্রায় আক্রমণ করে তাহার নাম শারীর। যথা জ্বর, অতিসার প্রভৃতি। যে রোগ শরীরকে অধিক মাত্রায় আক্রমণ না করিয়া মনকে সমধিক রূপে আক্রমণ করে তাহার নাম মানস। যথা উন্মাদ, মূর্চ্ছা প্রভৃতি। শারীর রোগও স্থূলতঃ ২ শ্রেণীতে গণ্য হইয়া থাকে। যথা ১ম আমাশয়োৎপন্ন, ২য় পক্বাশয়োৎপন্ন অর্থাৎ অপক্ব বস্তুর পরিপাকের প্রাণাধার বলিয়া আমাশয় বলিয়া থাকে। *

নাভির নিম্ন স্থানে অগ্নে পাচকাগ্নির দ্বারা পরিপাক প্রাপ্ত বস্তুর অসারাংশ গুলি যাহা পরিশেষে পুরীষ মূত্র রূপে পরিগণিত হয়, এই স্থানকে পক্বাশয় বলে। যে রোগে আমাশয়স্থ ক্লেদক শ্লেষ্মা পাচকাগ্নির বিকৃতি প্রযুক্ত প্রাদুর্ভূত হয় তাহার নাম আমাশয়োৎপন্ন রোগ, যথা জ্বর বমন ইত্যাদি। পক্বাশয় দূষিত করিয়া যে রোগ প্রাদুর্ভূত হয় তাহার নাম পক্বাশয়োৎপন্ন, যথা গ্রহণী অতিসার ইত্যাদি। অতি বলিষ্ঠের সহিত দুর্ব্বলের বাহু যুদ্ধাদিবশতঃ শারীর যন্ত্রাদির বিলোড়ন বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিনাশ বা অকর্ম্মণ্যতা প্রভৃতি যে সমস্ত আগন্তুক পীড়া উপস্থিত হয় তাহাদিগকে সংঘাতবল-প্রবৃত্ত বলে। এই শ্রেণীর পীড়া সমূহ আদিভৌতিক রোগ বলিয়া গণ্য। ইহাও স্থূলতঃ দুই প্রকার, ১ম শস্ত্রাদি কৃত, ২য় ব্যাঘ্রাদি প্রাণীকৃত। তরবারী বর্শা প্রভৃতি শস্ত্রঘাতীর গুলি, লাঠী প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা আঘাত বা পর্ব্বত বৃক্ষাদি অত্যুচ্চ স্থান হইতে নিম্নে পতন ইত্যাদি কারণে শারীর যন্ত্রাদি অতিশয় আহত হওয়ায়, আংশিক বিকৃতি প্রাপ্ত বা বিপর্য্যস্ত এবং বাতাদি দোষ পদার্থের প্রকৃতির অন্যথাভাব ঘটিলে তাহাকে শস্ত্রাদি-কৃত আগন্তুক রোগ বলে। ব্যাঘ্র, ভল্লুক, কুক্কুর, সর্প প্রভৃতি জন্তুতে দংশন করিয়া কোন স্থান ক্ষত করিলে তদ্দ্বারা শরীরের বিকৃতি এবং তাহাদিগের বিষ দ্বারা দেহের যে অন্যথাভাব উপস্থিত হয়, তাহাকে এস্থলে ব্যালাদিকৃত আগন্তুক রোগ বলা হইয়াছে।

---

* বাতপিত্তং কফঃ প্রোক্তঃশারীরো দোষ সংগ্রহঃ মানসঃ পুনরুদ্দিষ্টে। রজশ্চ তম এব চ শরীর দূষণাৎ দোষঃ—বাগ্‌ভটঃ।

নাভেঃ স্তনান্তরং জন্তোরামাশয় ইতিস্মৃতঃ। ভাবপ্রকাশ

চুলের কলপ।

(কবিরাজ শ্রীব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ)

:০: —

শিয়ালদহ ষ্টেশনের ১নং প্ল্যাটফর্মে—অপরাহ্নের "রাণাঘাট লোকালে", এক খানা দেড়া মাশুলের গাড়ীতে বসিয়াছিলাম। কামরায় ৬ খানি বেঞ্চ—তাহাতে আরোহীর সংখ্যা ৫৮ জন। আমার ঠিক্ সম্মুখে—এসিয়াটিক সোসাইটীর প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিত বিনোদ বিহারী বিদ্যাবিনোদের বিরাট বপু। তিনি হতাশ দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিকে চাহিতেছিলেন এবং পৌষ সংক্রান্তির জড়তাময়ী হিমানীর মধ্যেও শিথিল হস্তে কপালের ঘাম মুছিতেছিলেন।

আমিই প্রথমে কথা আরম্ভ করিলাম। কথা—প্রত্নতত্ত্বের। ক্রমে বিদ্যাবিনোদের মুখে প্রকাশ পাইল—নৈহাটীর শাস্ত্রী নাকি বৃদ্ধ বয়সে হিন্দুর চির উপাস্য শিব সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন; তাঁহার গুরু গম্ভীর গবেষণায় সপ্রমাণ হইয়াছে—মহাযোগী মহাদেব সভ্যদেবতার স্বজাতি নহেন, তিনি একজন শক্তিশালী অনার্য্য পুরুষ। এরূপ অপূর্ব্ব সিদ্ধান্ত যে স্থবির ব্রাহ্মণ শাস্ত্রীর লেখনী প্রসব করিতে পারে—এ ধারণা—আমার একেবারেই ছিলনা। আমি কোনও তর্ক করিলাম না। সহৃদয় শ্রোতার মত কেবল শুনিতেই লাগিলাম। একা বিদ্যা বিনোদ আর কতক্ষণ বকিবেন? সুতরাং তাঁহার আলোচনা—সুদূর শ্রুত বন্যার বারি-কল্লোলের মত মন্দীভূত হইয়া পড়িল।

আমার পার্শ্বে বসিয়া এক ভদ্রলোক বিকট দাড়ীযুক্ত মুখে "চীনা বাদাম" চিবাইতেছিলেন। তিনি পূর্ব্ববঙ্গবাসী। আমাকে আয়ুর্ব্বেদ কলেজের একজন অধ্যাপক জানিতে পারিয়া লোকটী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন—তাঁহার "অর্শের ব্যায়রাম আছে, যাহাতে প্রত্যহ কোষ্ঠশুদ্ধি হয়—আমি এমন কোন মুষ্টিযোগ জানি কি না? তাঁহার চীনা-বাদাম চর্ব্বণের ক্ষিপ্রতা দেখিয়াই আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলাম—এ ভাবে চীনাবাদামের জোলাপ লইলে "অর্শের ব্যায়রাম"—বিবাদের ব্যায়রামে পরিণত হইবে। তখন তাঁহার অবস্থাটা কৌরবনাথ দুর্য্যোধনের মত না হইয়া দাঁড়ায়!

এই সময় ট্রেণ আগড়-পাড়া ষ্টেশনে আসিয়া থামিল। ভাগ্যগুণে যে কয়জন আরোহী নামিয়া গেলেন, তাহার তিন গুণ লোক আমাদের কামরায় উঠিল। আমি রেল কোম্পানীর নিয়ম নির্দ্দেশের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। গাড়ীর গাত্রের কাষ্ঠফলকে শুভ্রোজ্জ্বল-হরপে লেখা ছিল—৩০ জন বসিবে। এত ভিড়েও কেহ আইন অমান্য করে নাই। ৩০ জন লোকই বসিয়াছিল, বাকী যাহারা উঠিয়াছিল—তাহারা বসিবার চেষ্টা না করিয়া—একবার

হইতে অক্তধার পর্য্যন্ত ঠেল মারিয়া শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া ছিল। এই দণ্ডায়মান-মানব-মহা-মণ্ডলের ভিতর আমি একখানি পরিচিত মুখ দেখিতে পাইলাম। কিন্তু এই বহু পুরাতন ও সনাতন পুরুষের সঙ্গে সহসা কথা কহিবার আমার সাহস হইল না। এইখানে—ইঁহার একটু পরিচয় দিব। ইনি আমাদের চুঁচুড়া সহরের একজন সম্ভ্রান্ত ধনী অধিবাসী। বয়স—বৎসর তিরাশী; দাদা দীননাথ ধরের ভাষায় বলিতে হইলে—ইঁহার দেহের অবস্থা-এখন "তীরে—আসি"। তিন বৎসর পূর্ব্বে ইনি এক দ্বাদশী দরিদ্র বালিকার কর ক্রয় করিয়াছিলেন। ভদ্র লোকটীর নাম আমি বলিব না। পাঠক! ইসারায় বুঝিয়া লউন। ইনি একজন প্রবীন লেখক। সমাজপতির "সাহিত্যে" ইঁহার রচনা একদিন সগৌরবে স্থান পাইত। "সাহিত্যপরিষদের" ত্রৈমাসিক পত্রে—প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রূপে এই বিশালকায় বৃদ্ধের আবির্ভাব। আগন্তুককে আমি ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলাম। চিনি চিনি করিয়াও যে চিনিতে পারি না—তুমি কে বট হে? তুমি কি আমাদের সেই? তবে কি আমি আজ আমার দীপ্ততার স্থির চক্ষুকেও অবিশ্বাস করিব? হায় বৃদ্ধ! তিন মাস পূর্ব্বে আমি যে তোমার উত্তমাঙ্গে—শারদ-শোভন শুভ্র কাশ-স্তবকের মত পক্ককেশ দেখিয়াছিলাম,—কে তাহাতে আজ প্রাবৃট্—কাদম্বিনীর গাঢ়-কালিমা ঢালিয়া দিয়াছে? বৃদ্ধ আমার মনের ভাব বুঝিলেন, তাঁহার মুখে নিদাঘ-সন্ধ্যার দিকচক্রবালে—বিদ্যুৎ বিকাশের ন্যায়—হাস্য-রেখা ফুটিয়া উঠিল। আমার কাণের কাছে মুখ আনিয়া—বৃদ্ধ বলিয়া ফেলিলেন—"আমি চুলে কলপ লাগাইয়াছি। অনেক কবিরাজের শরণাগত হইয়াছিলাম,—জলের মত টাকা খরচ করিয়াছিলাম,—কিন্তু কোন কবিরাজই আমার ভাল কলপ দিতে পারেন নাই। শেষে—একখানা ইংরাজী খবরের কাগজে—এই কলপটীর বিজ্ঞাপন পড়িয়া কিনিয়া আনাই। ইহাতেই আমার শাদা চুল কালো হইয়া গিয়াছে। এখন আমি বোধ হয় জোর গলায় বলিতে পারি—আয়ুর্ব্বেদে এমন উৎকৃষ্ট কলপ নাই। এই বিলাতী কলপটীর নাম—"মর্ণিংষ্টার, আপনি শিখিয়া রাখুন, অনেক সময় কাজে লাগিবে।"

আমি আজীবন আয়ুর্ব্বেদের উপাসক, আয়ুর্ব্বেদের অনন্ত মহিমায়—বিজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান আমার কাছে এক হইয়া গিয়াছে। আমার সেই সব সুখ দুঃখ মন্থন ধন আয়ুর্ব্বেদকে—এই স্বার্থমোক্ষ বৃদ্ধ—আজ আমারই সম্মুখে উপহাস করিতেছে? মরনোন্মুখের মাথার শাদা চুল কাল হয় নাই বলিয়া—সনাতন আয়ুর্ব্বেদের অপূর্ণতা দেখাইয়া দিতেছে? মূঢ়তার এতস্পর্দ্ধা! রোষে ক্ষোভে—আমার হৃদয় ফাটিয়া গেল। দেশের উপর অভিমান হইল। কলপের উপর বিতৃষ্ণা জন্মিল, যে কলপ অবিষ্কার করিয়াছে—তাহার প্রতিও মনে একটা বিজাতীয় ঘৃণা আসিল। আমি ভাবিতে লাগিলাম—মানুষের জীবনে যে এত কুহক, এত মায়া, এত সৌন্দর্য্য, তাহার পরিণাম কি? মৃত্যু। মরণের সম্মুখে জীবনকে উৎসর্গ করিতে হইবে। আমরা হিন্দু,।

মৃত্যু আমাদের পক্ষে ভয়াবহ নহে, দুষ্পূরণীয় কৌতূহল লইয়া—হিন্দু বারম্বার জন্ম গ্রহণ করিতে চাহেনা। হিন্দু চায়—মৃত্যু, অনিত্যের রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া নিত্যের ক্রোড়ে স্থান। হায়! জীবনের আবর্ত্তে পড়িয়া ঘুরিতে ঘুরিতে আমরা যেন মরণের ভাবনা ভুলিয়া না যাই। কক্ষ হইতে যেন কক্ষান্তরে না নিক্ষিপ্ত হই। কেন্দ্রস্থ হইয়া যেন স্থির থাকিতে পারি। আমাদের বিজ্ঞান যতক্ষণ ছিল—ততক্ষণই জীবন; মৃত্যু আসিলে, রাত্রি আসিবে। "জীব জগৎ" বলিয়া এই বিরাট বিশ্ব প্রদর্শনী ক্ষেত্রে—বয়সের স্বতন্ত্র বিভাগ—ক্রমস্তর আছে। হিন্দু ইহা চিরদিন বুঝে,—এমন হিন্দুর দেশে—কোন্ সৃষ্টি কুশলী প্রতিভা কলপের আবিষ্কার করিবে? হিন্দুর কর্ম্মক্ষেত্রে—চুলের কলপে কাজ কি? মানুষ চুলে কলপ দেয় কেন? কলপের অর্থ কি। শাদাকে কাল করা, বয়সকে গোপন করা, যৌবনাতীতের পক্ষে যৌবনের ভাণ্ করা। অতএব কপটতাই কলপের মূল! গৃহে—কিশোরী বধূ বিরাজিতা, হৃদয়ে—যৌবনের সুখ লালসা বর্ত্তমান, অথচ বৃদ্ধ বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা হয়; এই জন্যই চুলে কলপ দিবার প্রয়োজন। বয়স ষাটের কাছাকাছি, লোকে যেন ত্রিশের বেশী বলিয়া ধরিতে না পারে। যৌবন নাই; যৌবনের উদ্যম তেজ উন্মাদনাও নাই, তথাপি বার্দ্ধক্য স্বীকারে অসম্মতি, এরূপ ব্যক্তি নিশ্চয়ই চুলে কলপ লাগাইবে। উপস্থিত জরা ত্যাগ করিয়া বিগত যৌবনের জন্য লালায়িত—কলপ তাহারই বিকাশ মাত্র। সংসারের ছায়ান্ধকারে—আপনার সঙ্গেও লুকোচুরি খেলা!

দাঁত পড়িয়া গেলে—দাঁত বাঁধাইবার কারণ কতকটা বুঝিতে পারা যায়। চর্ব্বণের সুবিধা হয়, কথাবার্ত্তা কহিবার ব্যাঘাত ঘটে না। কিন্তু চুলে কলপ দিবার সার্থকতা কি? কেবল প্রবঞ্চনা! আপনাকে প্রবঞ্চনা, পরকেও প্রবঞ্চনা। কলপের একমাত্র উদ্দেশ্য—প্রবঞ্চনা। হায় বৃদ্ধ! আজ তুমি পক্ক কেশে কলপ মাখিয়াছ, কিন্তু যম তাহাতে ভুলিবে কি? যৌবন আর ফিরিবে কি? বয়স স্থির হইয়া থাকিবে কি? তবে শুভ্র-কেশ দেখাইতে তুমি কুণ্ঠিত হও কেন? শাদা-চুলের কি শোভা নাই? শ্বেত কি সৌন্দর্য্য হীন? আমাদের ভারতবর্ষে- প্রাচীন ব্যক্তি সকলেরই পূজনীয়। প্রাচীনের পরামর্শে—সংসারের সর্ব্ববিঘ্ন বিনষ্ট হয়, প্রাচীনের পদ-প্রান্তে যুবক মাথা হেঁট করে,—আমাদের আবার পাকাচুল ঢাকিবার চেষ্টা কেন? এ দেশে কলপের আদর কখনই ছিল না। যযাতির উপাখ্যান পড়িয়া দেখ—চিরযৌবন চিরসুখের উপায় নহে। যযাতি বৃদ্ধ হইলেও চুলে কলপ দেন নাই, লোল চর্ম্মে—অনুলেপন মাখেন নাই, আস্য গহ্বরে কৃত্রিম দন্ত ধারণ করেন নাই,—তবুও প্রকৃত যৌবন ফিরিয়া পাইয়াছিলেন। সে যৌবন সহস্র বৎসর ধরিয়া ভোগ করিয়াও তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই। যৌবনে তৃপ্তি কোথায়? তৃষা—কখনও শান্ত হয় না, আকাঙ্ক্ষা মিটে না। জরা—যৌবনের স্বাভাবিক নিবৃত্তি। যৌবনের সমস্ত অশান্তি উপদ্রব অপনীত হইয়া বার্দ্ধক্য শান্তি ও শৃঙ্খলা

আনিয়া দেয়। চাঞ্চল্য—স্থৈর্য্যে পরিণত হয়। কালের নিয়ম কি কলপে ফিরিতে পারে?

জগতে যখন সত্যের সমাদর ছিল, সরলতার সম্মান ছিল, তখন কেহ কেশে কলপ দিত না। যৌবন গেলে তখন যৌবনের সুখলালসাও তিরোহিত হইত, বার্দ্ধক্যের সঙ্গে অনাবিল শুচিতা দেখা দিত, বিশ্বব্যাপ্ত দুরতিক্রম্য প্রলোভন রাশির মধ্যে আপনার পথ খুঁজিয়া লইবার জন্ত শাদা চুলে কেহ কালি লেপিত না। পাকাচুল মানুষকে পরিপুর্ণ এবং পবিত্র করে। জীবনের সম্যক স্ফূর্ত্তি ও বিকাশ আনিয়া দেয়। পাকাচুলে—হৃদয় তাহার অন্ধ রুদ্ধ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বিশ্ব চরাচরে ছড়াইয়া পড়ে। সমস্ত সৃষ্টির ভিতর ব্যাপ্ত হইয়া যায়। পাকা চুলে—প্রেমের প্রগাঢ় নিবিড় অনুভব, তাহাতে তাহাতে আড়ম্বর বা ভঙ্গী নাই পুণ্যের পবিত্রতায় তাহা উন্মুক্ত উদার আনন্দ ময়। কাঁচাচুলের শোভা মাধুর্য্য মদিরতায় মিশ্রিতঃ—বসন্তের উৎফুল্ল কোলাহলে ক্লান্ত। পাকাচুলের সৌন্দর্য্যে সমস্ত শরতের জ্যোৎস্না ঢালা, কামনা ক্ষয়ের আয় প্রকাশ! সমাজ যখন স্বাভাবিক নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হইত, লোকে তখন বয়স বা বার্দ্ধক্য গোপন করিবার কল্পনাও করিত না! বাল্যে বিদ্যাভ্যাস, যৌবনে সংসারাশ্রম, বার্দ্ধক্যে বিষয় বুদ্ধির বিরাম,তখন ছলনা প্রবঞ্চনার আবশ্যকতাই ছিল না। ক্রমে সমাজ ও জীবন সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিল, নির্দ্দিষ্ট বয়সে নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যের প্রতি আস্থা শিথিল হইতে লাগিল, ভোগ লালসা প্রবল হইল, ষোড়শোপচারে পঞ্চবাণের পূজা আরম্ভ হইল। বৃদ্ধ বালিকা ভার্য্যা গৃহে আনিল, পলিতকেশ দেখাইতে লজ্জা বোধ করিল, তাহার মনে প্রশ্ন উঠিল, শাদাচুল কি কাল করা যায় না? যায় বই কি। চুলের কলপ অমনি আবিষ্কৃত হইল। সংসারে ও সমাজে কৃত্রিমতা ও কপটতা আসর জাঁকাইয়া বসিল।

তখন চুলের কলপ গোপনে বিক্রয় হইত। অনেক অর্থব্যয় করিয়া শাদাকে কাল করিতে হইত। এখন কাগজে কাগজে কলপের প্রকাণ্ড বিজ্ঞাপন, গলিতে গলিতে অনায়াস লভ্য কলপের দোকান। ক্রেতা বিক্রেতা কাহারও লজ্জা নাই। লোক বুঝিতে পারিল যে দেশে বাহাত্তুরে বুড়ার জন্ত বালিকা বধু পাওয়া যায়—সেদেশে কলপ পাওয়া যাইবে না কেন?

দুঃখের বিষয়—যে সকল দেশের অনুকরণে, এই ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতে এত বিলাসিতা বাড়িয়াছে, সে সকল দেশে বার্দ্ধক্যে কেবল যৌবনের ইন্দ্রিয় প্রবণতাই নাই, আরও অনেক জিনিস আছে। যৌবনের উদ্যম আছে, উৎসাহ আছে, একাগ্রতা আছে, স্বার্থশূন্ত পরিশ্রমের আদর্শ দৃষ্টান্তও আছে। আমাদের দেশে কি আছে? কেবল পাকাচুলে কলপ দেওয়ার প্রথা আর মিথ্যা প্রবঞ্চনা ভণ্ডামী ও কপটতা। হায় প্রতারণা পরায়ণ প্রেম পিয়াসু বৃদ্ধ! তোমরা শাদা চুলকে যেমন কাল করিবার কৌশল শিখিয়াছ, কাল মুখকে তেমনি শাদা করিতে শিখিলেনা কেন? তাহা হইলে যে অনেক লাভ ছিল। কিন্তু কৈ, সে যে, অসম্ভব; কত সাবান কত পাউডার, কত ডায়মেটোন মিল্ক অফ্ রোজ কিছুতেই তো কাল মুখ শাদা হইল না। ক্যালিডরও কোন কাজে আসিল না।

আমাদের এক জনের মুখ ও গোবার মুখের মত হইল না। হইবে কেন? এ মুখ যে আগুণে পুড়িয়া কাল হইয়াছে। শক্রর সোণার লঙ্কা দগ্ধ করিয়া এ মুখ তো কাল হয় নাই, আত্মগৃহদাহের কলঙ্ক কালি এ মুখে লাগিয়া রহিয়াছে। বল দেখি ভাই! চুলের কলপ মুখে মাখিলে কেমন হয়? তাহাতে কি জাতীয় প্রাচীনতা বজায় থাকে?

আমার মনে অহঙ্কার আছে—আমরা অন্যের চেয়ে সনাতন ও প্রাচীন। কিন্তু সে অহঙ্কার টুকুও বুঝি ঘুচিয়া যায়। আমাদের মধ্যে যাঁরা বড়, তারা যে যৌবনের ভাণ ধরিয়াছেন। শুভ্রকেশ লইয়া, বার্দ্ধক্যের বিজ্ঞতা বহুদর্শিতায় তন্ময় হইয়া আর যে কেহ শেষ জীবন শান্তিতে কাটাইতে সম্মত নহেন। এখন যে দিকে যাই—সেই দিকেই দেখি গত যৌবনের জন্য অনুশোচনা। যৌবন নাই, যৌবনের প্রাণশূন্য প্রতিমূর্ত্তি আছে। যৌবনের বল নাই, বিভ্রম আছে। যৌবনের দৃঢ়তা নাই, চাঞ্চল্য আছে; যৌবনের উৎসাহ নাই, লালসা আছে। চারিদিকেই দেখি চুলের কলপ; সব ঝুটা, সব মিথ্যা, সব প্রবঞ্চনা, সব অসার! বিলাসের দাস। যদি সময় থাকিতে একটু সতর্ক হইতে, যদি যৌবনের চিহ্ন থাকিতে থাকিতে আয়ুর্ব্বেদের রসায়ন তন্ত্রের শরণ লইতে, তাহা হইলে যে তোমার যৌবন স্থির থাকিত, অকাল বার্দ্ধক্যে কখনও তুমি অবসন্ন হইয়া পড়িতে না! শাদা মাথায় কলপ মাখিয়া—দিনের আলোয় সঙ্ সাজিতে না। আয়ুর্ব্বেদে এমন ঔষধ আছে—যাহার প্রসাদে তোমার দেহে জরা আক্রমণ করিত না। বিশ্বামিত্রের ত্রিবিদ্যা সাধনের মত—অনায়াসেই তুমি ঘরের তৃতীয় পক্ষকে শাসন করিতে পারিতে।

যে ভ্রম করিয়াছ, তাহা তো সংশোধন করিতে চাও না। তবে চালাও। কলপ দিয়া শাদা চুলকে কালো কর, বাঁধানো দাঁত বাহির করিয়া—যুবকের মাঝে বসিয়া কৌতুক হাস্যে মত্ত হও, বর্ষীয়সী বনিতার বিয়োগান্তে—বংশধর বর্ত্তমানেও বালিকা বিবাহ কর, সংসারের চ'খে ভেল্কী লাগাও, যমকেও ফাঁকি দাও, কিন্তু তোমার ভবিষ্যৎ বড় তমসাচ্ছন্ন। কিছুতেই তোমার পরিত্রাণ নাই। শমন তোমায় ছাড়িবে না, প্রতারক বলিয়া আমরাও তোমায় গালি দিব। অস্তের সূর্য্যে কি উদয়ের আলোক শোভা পায়? গোপন অপরাধের সঙ্কোচে নিজের কাছেই তুমি নিজে কুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছ। এই কি তোমার কলপের মহিমা? ঐ শুন কবি তোমায় সম্বোধন করিয়া কি বলিতেছেন।

"—ওরে স্থবির! দুঃখ কেন, এলো না হয় জরা
ভেবে দেখ, বাঁচার চেয়ে কত সহজ মরা।"

আর্য্য চিকিৎসা।

[শ্রীসতীশচন্দ্র রায়, চট্টোপাধ্যায় বি-এল]

ভারতের এই ঘোর অন্নবস্ত্রের কষ্টের দিনেও মহার্ঘতার দিনে চিকিৎসা বিরাট এক বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু এ বিষয়ের প্রতীকারের বিশেষ কোন চেষ্টা হইতেছে না।

রোগ আমাদের দেশে বড় বেশী বেশী হইয়াছে এমনকি আহার্য্য সংগ্রহ যেমন দৈনিক কার্য্যের মধ্যে প্রয়োজন, চিকিৎসক দেখান ও ঔষধ সংগ্রহ করাও সেইরূপ বা তদপেক্ষা বেশী আবশ্যকীয় কার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের দেশ যেরূপ দরিদ্রতার চরম সীমায় আসিয়াছে ও লোক যেরূপ স্বাস্থ্যহীন হইতেছে তাহাতে চিকিৎসা—স্বাস্থ্যের উপযোগী ও অল্পব্যয়ে প্রাপ্য না হইলে যে আমাদের জাতির লোপ অনিবার্য্য সে বিষয় কেহ চিন্তা করেন না। পূর্ব্বের ন্যায় চিকিৎসক নির্লোভী নন। এখন ডাক্তার কবিরাজ হাকিমের কলিকাতার সৌধে বিলাস বাসের খরচ, মোটর গাড়ীর খরচ—সবই রোগীর উপর নানারূপে আসিয়া পড়িতেছে, সেই জন্য অনেক গরীব চিকিৎসা করাইতে না পারিয়া অকালে কালকবলে পড়িতেছে। পল্লীগ্রামেত চিকিৎসক নাই বলিলেই হয়। হাতুড়ে বৈদ্য ত আরও ভীষণ, কালের দ্বিতীয় মূর্ত্তি ধরিয়া অকালে বহু লোককে যম সদনে প্রেরণ করিতেছে। এখনও অনেক সুচিকিৎসকের আবশ্যক। সকলেরই ইংরাজী চিকিৎসার দিকে দৃষ্টি। কিন্তু সে শিক্ষা কোথায় পাওয়া যায়। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ, কারমাইকেল কলেজে, ক্যাম্বেল স্কুল প্রভৃতিতে প্রবেশ করা কি ব্যাপার তাহা অনেকেই জানেন। বি, এস সি. এম, এম, সি, —ভাল ভাল সুরুব্বি, এখানে ওখানে দৌড়াদৌড়ি প্রভৃতিতে অর্থ ব্যয়ে তাহার পর কাহারও ভাগ্যে প্রবেশ লাভ ঘটিল কাহারও ভাগ্যে ঘটিল না। যাহার ঘটিল না তিনি হতাশ হইয়া চিকিৎসা শিক্ষা ত্যাগ করিলেন আর যাহার ভাগ্যে প্রবেশ লাভ ঘটিল তাহার বিপুল অর্থব্যয়, শারীরিক পরিশ্রম ৬ বৎসরের স্থানে কাহারও ৮ বৎসর কাল শিক্ষালাভ, ব্যাপারতো এই, তাহার পর কেহ পাশ হইয়া বাহির হইলেন, আর যিনি মধ্যেই বহিষ্কৃত হইলেন তিনি ষাঁড়ের গোবর হইয়া আসিলেন ঐ সব দেখিয়া শুনিয়াও আমাদের দেশের লোক ইংরাজি চিকিৎসার পক্ষপাতী। দেশের বড় লোকেরাও দু চারটি আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় স্থাপনও উহার সুচারুরূপে সঞ্চালনও করিতেছেন না ও কলিকাতার বিখ্যাত কবিরাজগণ নিজের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অর্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ছাত্রগণকে সৎশিক্ষা নিজের অভিজ্ঞতার ফল জানাইতেছেন না। ইহা অপেক্ষা আমাদের দুর্দ্দশা কি হইতে পারে। যাহারা ইংরাজী চিকিৎসাগারে স্থান না পান তাঁহারা কেন যে আয়ুর্ব্বেদোক্ত বা হাকিমী চিকিৎসা শিক্ষা করিতে

প্রয়াস পান না তাহা আমি এই ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিয়া উঠিতে পারি না। একজন কলিকাতা প্রবাসী আমেরিকান বলিয়াছেন যে, ভারতের অভ্যুদয় দুইটি কার্য্যের দ্বারা হইবে ; প্রথম কৃষিকার্য্যের উন্নতি, দ্বিতীয় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার প্রচলন। আমাদের দেশে দুইটীর প্রতিই লোকের দৃষ্টি নাই। তাহার নানা কারণ। চিকিৎসক পাইলেও ঠিক ঔষধ মিলে না, ঔষধ পাইলেও রোগী বা তাহার আত্মীয়স্বজন সহজপ্রাপ্য বহু মূল্য ঔষধ বরং দিবে কিন্তু একটু পরিশ্রম দ্বারা অল্প মূল্য বা বিনামূল্যে প্রাপ্য ঔষধ দিবেনা। একবার আমার কোন বন্ধুর পুত্রের সর্দ্দি কাশী হওয়ায় আমি তাঁহাকে বলি যে, আপনার পুত্রকে বাসকপাতার রস মধু দিয়া প্রাতে খাওয়ান, সর্দ্দি কাশী ভাল হইয়া যাইবে। তিনি অত কষ্ট কে করে বলিয়া এক শিশি সিরাপ অফ্ বাকস্ ৸৹ আনা দিয়া কিনিয়া আনিয়া পুত্রকে সেবন করাইতে লাগিলেন ; তাহাতে বড় ফল হইল না, কিন্তু আর একটি লোক এই কথা শুনিয়া বাকস পাতার রস ও মধু সেবন করাইয়া তাঁহার কন্যার সর্দ্দি কাশীর উপশম করান। ফল কথা এ দোষ আমাদের খুব যে, আমারা দুই আনা পয়সা খরচ করিয়া ৭ দিনের পাঁচন সংগ্রহ করিতে কুণ্ঠিত হই, কিন্তু দুই টাকা দিয়া শিশির তৈয়ারী ঔষধ কিনিতে কুণ্ঠিত নহি।

এখন দেখিতে হইবে কোন প্রকার চিকিৎসা আমাদের দেশের উপযোগী? আমি যদি বলি যে, কবিরাজ বা হাকিমী চিকিৎসাই ভাল, অমনি আমাকে অনেক লোক গালাগালি করিবেন, কিন্তু সেই গালাগালি দিবার পূর্ব্বে একবার বিচার করিয়া পাঠক মহাশয় দেখুন দেখি, কোন্ চিকিৎসা আমাদের উপযোগী? অনেক বলিবেন, ম্যালেরিয়া হইয়াছে কুইনাইন না দিলে কি করিবে? আমি জিজ্ঞাসা করি, কুইনাইন দিয়া ম্যালেরিয়ার বিষ নষ্ট করিলেন, কিন্তু কুইনাইন দ্বারা শরীরের যে অনিষ্ট হইল, তাহা যায় কিসে? কুইনাইন সেবনের অনিষ্টকারিতা কিঞ্চিৎ পাচন ভিন্ন নষ্ট হয় না ইহা বহুবার দেখা গিয়াছে ও অনেকের এ বিষয়ে অভিজ্ঞতাও আছে, সেই জন্য এ বিষয় আর বেশী বলিলাম না। আমাদের শাস্ত্রে আছে :—

"যস্ত দেশস্ত যো জন্তু-তজ্জং তদৌষধম্ হিতম্"

যে ব্যক্তি যে দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন সেই দেশ জাত ঔষধই তাঁহার পক্ষে হিতকর। ডাক্তারি ঔষধ অধিকাংশই ইয়োরোপে প্রস্তুত। তাহা শীতপ্রধান দেশে ও সেই দেশের লোকের উপযোগী করিয়া প্রস্তুত। তাহার পরিমাণও সেই দেশের লোকের উপযোগী করিয়া প্রস্তুত। কাজেই উহা আমাদের গ্রীষ্ম প্রধান দেশের লোকের নিকট উগ্রবীর্য্য হইয়া উঠে ও তাহাতে উপকারের সহিত অনিষ্ট সাধনও করে। মনে করুন, আপনার দেহে একটি মশক বসিয়া দংশন করিতেছে। আপনি তাহাকে তিন উপায়ে নষ্ট করিয়া আপনাকে দংশন জ্বালা হইতে রক্ষা করিতে পারেন। একটি সূচি লইয়া তাহাকে সরাইয়া দিতে পারেন, কিন্তু সূচিটি ঠিক না লাগিলে শরীরে আঘাত লাগিতে পারে। ইহার সহিত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার তুলনা হইতে পারে, অনেক পড়িয়া অনেক ভাবিয়া ঠিক রোগ নির্ণয় করিয়া যে

ঔষধে ঐ সকল রোগের লক্ষণ মিলে তাহার প্রয়োগে ঐ রোগ উপশমিত হইতে পারে। এক বিন্দু ঔষধে মন্ত্রের ন্যায় রোগ সারিয়া যাইতে পারে, কিন্তু সূচি লইয়া ক্ষুদ্র মশকের দেহ বিদ্ধ করা যেমন সূক্ষ্ম দৃষ্টির আবশ্যক সেই প্রকার রোগ নির্ণয় ও হোমিওপ্যাথিক ঔষধ নির্ব্বাচন করাও বিশেষ পাণ্ডিত্য, বিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞতার আবশ্যক। আবার ঔষধও ঠিক মত তৈয়ার ও ঠিক ক্রম ও অবিকৃত অবস্থায় পাওয়াও আবশ্যক। রোগ নির্ণয় ও ঔষধ নির্ব্বাচন আমার হাতে, কিন্তু উহার প্রস্তুত ও অবিকৃত অবস্থায় রাখা অন্যের হাতে ও সম্পূর্ণ আমার অজ্ঞাত। দ্বিতীয় উপায় মশককে এক চপেটাঘাত করা, উহাতে মশক ত মরিবেই, কিন্তু যাহার উপর ঐ চপেটাঘাত পড়িবে তাহারও মশক দংশন অপেক্ষা যাতনা অত্যধিক হইবে। মশকের দেহস্থ বিষও আমার শরীরে লাগিয়া লোমকূপদ্বারা শরীরে প্রবেশ করিতে পারিবে। এই উপায়ের সহিত এলোপ্যাথিক চিকিৎসার তুলনা হইতে পারে। এলোপ্যাথিক ঔষধ যদি বিজ্ঞ চিকিৎসক আমাদের দেশের লোকের উপযোগী মাত্রায় প্রয়োগ করেন, তবে অনেক ব্যাধির ভীষণ প্রকোপ অবস্থায় খুব ক্রিয়া করে, তবে সেই ক্রিয়ার স্থায়িত্ব বিবেচ্য। বিশেষতঃ এলোপ্যাথিক ইংজেকসান-চিকিৎসা অত্যন্ত ধীরতা ও সতর্কতার সহিত প্রযুক্ত না হইলে অনেক সময় বিপরীত ফল প্রদান করে। তৃতীয় উপায় মশক নিরাকরণের জন্য কোন বিশুদ্ধ গব্য ঘৃতাক্ত তুলার গুলি দ্বারা মশককে আবৃত করা, উহাতে মশকটি ঐ তুলায় লাগিয়া যায় ও তুলার সহিত যে ঘৃত থাকে তাহাতে উহার দংশন জনিত জ্বালা ও বিষ নিবারণ করে। আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধও সেই প্রকার রোগ নিরাময় করে এবং ঔষধ জনিত কষ্ট ও হয় না। তবে ইহাতেও বিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞতা নির্ভর করে। রোগ নির্ণয় ও ঔষধ নির্ব্বাচন ও উপযুক্ত ঔষধও ইহাতে তদ্রূপই অত্যাবশ্যক।

এই সকল বিচার করিয়া দেখিলে রোগের প্রবলাবস্থায় হোমিওপ্যাথিক বা এলোপ্যাথিক ঔষধ ও ইন্‌জেক্‌সান উপযোগী হইলেও কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসা যে আমাদের দেশের লোকের পক্ষে সম্যক্ উপযোগী ও সস্তা সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ হইতে পারে না। হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় উপযুক্ত ডাক্তারগণ তৎক্ষণাৎ উপযুক্ত ঔষধ না পাইলে কিছুই করিতে পারেন না। ঔষধের জন্য তাঁহারা অন্যের মুখাপেক্ষী ও ঔষধ ঠিক প্রস্তুত হইল কিনা ও তাহা পুরাতন হওয়ায় হীনবীর্য্য হইল কিনা, জানিবার উপায় একরকম নাই বলিলেই হয়। কিন্তু কবিরাজ বা হাকিমগণকে চিকিৎসা শিক্ষা কালেই গাছ গাছড়া চেনা ও ঔষধ প্রস্তুত শিক্ষা করিতে হয়। তাহার পর চিকিৎসা—শাস্ত্রমত অধ্যয়ন করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চিকিৎসা কার্য্যে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে নিজে কতকগুলি প্রচলিত ঔষধ তৈয়ার করিয়া চিকিৎসা করিতে বসিতে হয়। চিকিৎসায় ঔষধের উপকারিতায় হ্রাসবৃদ্ধি যেমন রোগীর বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে, তেমনি চিকিৎসকের রোগ

নিবারণের ইচ্ছা—শক্তির উপর নির্ভর করে। দ্রব্যগুণের সঙ্গে যে আর একটা আভ্যন্তরিক শক্তি ক্রিয়া করিতেছে তাহা অনেকেই লক্ষ্য করেন না। যে ঔষধ ধাতুভস্ম হইতে আরম্ভ করিয়া মসলাদি চূর্ণ করিয়া পাককার্য্য পর্য্যন্ত নিজ হস্তে শুদ্ধভাবে সম্পন্ন করিতে হয়—তাহার ফল যে কত সুন্দর তাহা কি আর বলিতে হইবে? এল, এম, এস্; এম, বি; এম ডি; পাশ করিয়া ডাক্তার বাবু হ্যাটকোট লাগাইয়া মোটরে চড়িয়া চিকিৎসা করিতে গেলেন। খুব আড়ম্বর করিয়া শরীরের যথা স্থানে ষ্টেথেসকোপ প্রভৃতি যন্ত্র লইয়া দেখিয়া রোগীর জন্য প্রেস্-ক্রিপসান লিখিয়া দিলেন, কিন্তু এমন ঔষধ দিলেন যে সহজে বা বাথ্‌গেট ভিন্ন অন্যত্র পাওয়া গেল না বা কোথাও পাওয়া গেল না, কেহ বলিলেন,—উহা নূতন ঔষধ। বিলাত হইতে আসিতেছে, এখনও পৌঁছায় নাই, অমনি ডাক্তার বাবুর বাহাদুরির সুনাম পড়িয়া গেল, এ দিকে রোগী রোগ যন্ত্রণায় ছটফট্ করিতে লাগিলেন। আমাদের দেশের লোক এমনিই মূর্খ যে, একজন বিজ্ঞ কবিরাজ বা হাকিমকে ডাকাইয়া তাঁহার নিকটে যে ঔষধ আছে বা ঘরের পাশে যাহা পাওয়া যাইতে পারে তাহা দিবার কোন চেষ্টা করিলেন না।

এ বিষয়ে একটি ঘটনা বলা বোধ হয় অযৌক্তিক হইবে না। আমাদের গ্রামের নিকট একটি গ্রামে আমার এক আত্মীয়ের স্ববিরাম জ্বর হয়, সেই জ্বর ১৭ দিন ভোগ করার পর তাঁহার প্রস্রাব রোধ হইয়া যায়। একজন ডাক্তার চিকিৎসা করিতেছিলেন। প্রস্রাব রোধের পর সেই রোগী কতকটা অজ্ঞান হইয়া পড়েন। ডাক্তার বাবু আসিয়া বলিলেন যে ক্যাথিটার দিয়া প্রস্রাব করাইতে হইবে, কিন্তু রোগী খুব দুর্ব্বল, জ্বরও প্রবল ও তাঁহার নিকট তেমন ক্যাথিটার নাই, তখন রোগীকে অতিকষ্টে সামান্য মত ঔষধ খাওয়ান চলিতেছে। তিনি এক রকম জবাব দিয়া চলিয়া গেলে একজন কবিরাজকে ডাকা হইল। তিনি সব দেখিয়া শুনিয়া পুকুর হইতে একটী ব্যাং ধরিয়া আনিতে বলিলেন। সেই ব্যাংটি রোগীর নাভির নীচে রাখিয়া তাহার উপর একটা বাটি চাপা দিয়া কবিরাজ মহাশয় রাখিলেন, কিছুক্ষণ পরে রোগী প্রচুর প্রস্রাব ত্যাগ করিয়া ফেলিল ও জ্ঞান আসিল ও ক্রমশঃ সেই কবিরাজের চিকিৎসায় আরোগ্যলাভ করিল। এখন পাঠক মহাশয় বুঝিয়া দেখুন কোন্ চিকিৎসা আমাদের বিশেষ উপযোগী?

আমার একজন বন্ধু ডাক্তার এম, বি পাশ। খুব ভাল চিকিৎসক বলিয়া খ্যাত ও গভর্ণমেণ্ট পেন্‌সনার, তাঁহার পা মচকাইয়া যায়, তাহাতে খুব কষ্ট পান, আমার বাড়ীতে রোগী দেখিতে অতিকষ্টে আসেন, আমি বলিলাম, আমার নিকট মহামাষ তৈল আছে, আজ রাত্রে শুইবার সময় বেশ করিয়া মালিশ করাইয়া আকন্দ পাতা দ্বারা সেঁক করাইয়া তুলা দিয়া বাঁধিয়া রাখিয়া দিবেন। তিনি তদ্রূপ করায় বলিলেন যে "আমার পায়ের ব্যথা একদিনে অর্দ্ধেক সারিয়া গিয়াছে। উক্ত তৈল for Superior to my Echthiol Belledona ointment মলম হইতে বহুলাংশে শ্রেষ্ঠ। ঐ তৈলে যে কেবল

আমার বেদনা নিবারণ হইতেছে তাহা নহে, শুইবার সময় আমার এত পা জ্বালা করে ভিজা গামছা পায়ে জড়াইয়া শুইতে হয়। উক্ত তৈল পায়ে মালিশ করার বেদনার উপশম ও জ্বালার শান্তি উভয়ই হইয়াছে।

আমায় আর একটি ডাক্তার বন্ধু এল, এম, এস ৩৪ দিন গৃধ্রসী-বাতে শয্যাশায়ী অবস্থায় নানাপ্রকার ঔষধ ইনজেক্‌সানাদিতে উপকার না পাইয়া আমার নিকট মহামাষ তৈলের সন্ধান পাইয়া উহার কিঞ্চিৎ লইয়া কোমরে দুই দিন মালিস ও সেকের পর এক মাইল পথ হাঁটিয়া যাইতে সক্ষম হন।

কবিরাজি তৈলের যে কি গুণ তাহা যিনি যথার্থ শাস্ত্রীয় মতে প্রস্তুত তৈল ব্যবহার করিয়াছেন তিনিই বলিতে পারেন। তৈলে ও ঘৃতে পাককৃত ঔষধের কিছু অংশও থাকে বলিয়া বোধ হয় না, কেবল সকল দ্রব্যের শক্তি গ্রহণ করিয়া লোমকূপ দ্বারা শরীরে প্রবেশ করিয়া অদ্ভুত উপকার হইয়া থাকে। এমন ঔষধ কি আর পাওয়া যায়?

আমাদের শরীরে অহরহঃ ক্ষয় কার্য্য চলিতেছে, উহা পূরণ না হইলেই আমাদের আয়ুক্ষয় এবং অকালমৃত্যু হয়। সহজ শরীরে যে ক্ষয় সাধিত হয় রোগের শ্বাস প্রশ্বাস দীর্ঘ ও ঘন ঘন হওয়ায় ঐ ক্ষয় ক্রিয়া আরও বেশী হয়। সেই জন্য রোগের ঔষধের সঙ্গে ঐ ক্ষয় ক্রিয়ার হ্রাস করার চেষ্টা না করিলে মৃত্যুকে ডাকিয়া আনা হয়। হোমিওপ্যাথিক বা অ্যালোপাথিক ঔষধে উহার পূরণ হয় না বলিয়া ডাক্তারেরা নানা প্রকার তৈয়ারী খাদ্যের ব্যবস্থা করেন, কিন্তু তাহাতে কখনও কখনও অনিষ্টও হয়। রোগের সময় যেমন ঔষধের আবশ্যক, তেমনি সুপথ্যও আবশ্যক। আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধে রোগ নিবারণের শক্তি ও আহার্য্য ক্রিয়া দ্বারা শরীরের ক্ষয় পোষণের ক্রিয়া যুগপৎ সাধিত হয়। অধিকাংশ লৌহ ঘটিত ঔষধ এই কার্য্য সাধন করে। ডাক্তারি লৌহে—কোষ্ঠকাঠিন্য করে, কেবল ferration Albuminatedtror বলিয়া ততটা করে না, কিন্তু কবিরাজী শোধিত লৌহ অমৃত তুল্য। উহাতে কোষ্ঠ কাঠিন্য না হইয়া কোষ্ঠ শুদ্ধি হয়। তাহা ছাড়া স্বর্ণ ঘটিত ঔষধে, আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঘৃত তৈলে রোগ নিবারণ ও শরীরের পুষ্টিসাধন ও ক্ষয় নিবারণ যুগপৎ হইয়া থাকে। অনেক পাচনে খাদ্যের কার্য্যও করিয়া থাকে। চ্যবনপ্রাশ, অমৃতপ্রাশ ঘৃত, অশ্বগন্ধাঘৃত বৃহচ্ছাগলাদ্য ঘৃত—গরম দুগ্ধ সহ সেবনে কি সুস্বাদু যাঁহারা সেবন করিয়াছেন তাঁহারাই বলেন এবং তাহাতে রোগ নিবারণ ও শরীরের পুষ্টিসাধন যে পরিমাণে করে, তেমনটি বোধ হয় পৃথিবীর আর কোন ঔষধে করিতে পারে না। কড্‌লিভার অয়েল খাইতে কত দুর্গন্ধ; তাহার সহিত চ্যবনপ্রাশের স্বাদের ও গুণের তুলনা হয় না।

ধনী-নির্ধন, রোগী-নীরোগ—সকলের নিকট আমার প্রার্থনা যে, যাহাতে আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধের বহুল প্রচলন হইয়া দেশকে দুঃখ দারিদ্র্য হইতে রক্ষা করে তাহার জন্য চেষ্টা করুন। যাহাতে আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে শবব্যবচ্ছেদ, শস্ত্র চিকিৎসা, শল্য চিকিৎসা, ধাত্রীবিদ্যা, ছাত্রদিগকে রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হয় তাহার ব্যবস্থা করুন। আর

মেডিক্যাল কলেজ প্রভৃতিতে যাঁহারা স্থান না পাইয়া হতাশ হইয়াছেন তাঁহারা আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত ও চকিত দেশকে প্রাচ্য চিকিৎসা বিদ্যায় পুনরায় উন্নত করিয়া লুপ্ত বিদ্যার পুনরুদ্ধার করুন। আমাদের যে সব বিদ্যা লোপ হইয়াছে পাশ্চাত্যশাস্ত্র হইতে তাহা লইয়া আমাদের আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞানকে পূর্ণ করিয়া দেশের ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধার কল্পে ছাত্রগণ যথাসাধ্য চেষ্টা করুন। একলব্যের পণের দিকে লক্ষ্য করিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য কলেজে প্রবেশে ভগ্নমনোরথ হইয়া আয়ুর্ব্বেদ কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া দেশের মুখোজ্জ্বল করুন। ফল কথা যিনি যত রকমে পারেন, যাহাতে আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসা পূর্ণাঙ্গ হইয়া দেশের রোগ নিবারণে সক্ষম হয় তাহার চেষ্টা করুন। ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা, গোপালন, গোসেবা প্রভৃতি কার্য্যের দ্বারা জীবনকে সুখী করিয়া "ধর্ম্মার্থকাম মোক্ষাণাং আরোগ্যমূলমুত্তমম্" এই বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করুন ও আপন আপন গৃহের নিকট বা বাগানে বা কলিকাতায় ছাদের উপরে টবে টবে ভেষজ দ্রব্য সকল যথাসাধ্য সংগ্রহ করিয়া রোপণ করিয়া রাখুন। করজোড়ে সকলের নিকট আমার এই অনুরোধ।

মোদক রহস্য।

(সম্পাদকীয়)

শ্রীমদনানন্দ মোদক নামক ঔষধটি বিজ্ঞাপনের মাহাত্ম্যে অধুনা সর্ব্বজন পরিচিত। বহু আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকের বিজ্ঞাপন-পুস্তিকা খুলিলেই এই মোদকটির পরিচয় পাওয়া যায়। কেহ কেহ চারি টাকা, তিন টাকা সেরেও ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। ইহা ভিন্ন, কলিকাতা সহরের রাজপথে, ফিরিওয়ালার কল্যাণে সাধারণে দুই চারটি পয়সা দিয়াও ইহা কিনিতে পাইতেছেন। পানের দোকানে, মনিহারি দোকানেও ইহা দুই চারিটি পয়সা দিলে পাওয়া যায়। ফলে আয়ুর্ব্বেদের একরূপ একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ ব্যবসায়ীদিগের পক্ষে যেরূপ অর্থাগমের পথ পরিষ্কৃত করিয়াছে, অপরদিকে সেইরূপ ইহার অবাধ প্রচলনের জন্য ইহা দ্বারা সাধারণের অনিষ্টও হইতেছে বলিয়া আমরা মনে করি, সেই জন্য এই ঔষধটির সম্বন্ধে কতকগুলি কথা বলিব।

এই ঔষধটীর প্রধান উপাদান হইল সিদ্ধিবীজ। এই ঔষধটি প্রস্তুত করিতে হইলে নিম্নলিখিত দ্রব্য গুলির প্রয়োজন হয়—পারদ, গন্ধক ও লৌহ—ইহাদের প্রত্যেকটি ১ তোলা, অভ্র ৩ তোলা, কর্পূর, সৈন্ধবলবণ, জটামাংসী, আমলকী, ছোট এলাইচ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, জৈত্রী, জায়ফল, তেজপত্র, লবঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, যষ্টিমধু, বচ, কুড়, হরিদ্রা, দেবদারু, হিজ্জলবীজ, সোহাগা, বামনহাটি, শুঁঠ, নাগেশ্বর,

কাঁকড়াশৃঙ্গী, তালিশপত্র, কিসমিস, চিতামূল, দন্তীবীজ, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, দারুচিনি, ধনে, গজ পিঁপুল, শঠী, বালা, মুতা, গন্ধ ভাদুলে, ভূমি কুষ্মাণ্ড, শতমূলী, আকন্দ মূল, আলকুশী বীজ, গোক্ষুর বীজ বৃদ্ধদারক বীজ ও সিদ্ধি বীজ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা। এই সকল চূর্ণ একত্র করিয়া শতমূলীর রস দ্বারা বাটিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করত পুনর্ব্বার চূর্ণ করিবে, তৎপর তাহার সহিত শিমুল মূল চূর্ণ ১২৫৫৹ তোলা এবং সিদ্ধি চূর্ণ ৩১৸৵৹ তোলা মিশ্রিত করিয়া ছাগদুগ্ধ দ্বারা বাটিবে, তদনন্তর সমস্ত চূর্ণের দ্বিগুণ পরিমাণ চিনি লইয়া প্রথমতঃ ছাগদুগ্ধ সহ উক্ত চিনি যথা নিয়মে পাক করিয়া লইবে। তৎপরে নামাইয়া উপরোক্ত চূর্ণ ঔষধ গুলি তাহার সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া পশ্চাৎ দারুচিনি, তেজপত্র, ছোট এলাইচ, নাগেশ্বর, কর্পূর, সৈন্ধব লবণ, শুঁঠ, পিঁপুল ও মরিচ - ইহাদের চূর্ণ এবং ঘৃত ও মধু অল্প পরিমাণে মিশ্রিত করতঃ মোদক প্রস্তুত করিয়া লইবে।

উপরে যে দ্রব্য গুলির ফর্দ্দ দেওয়া হইল, তাহার মূল্য কত পাঠক যদি বিবেচনা করেন, তাহা হইলে এই মোদক তিনটাকা, চারি টাকা সেরে এবং ফিরিওয়ালার হাতে দুইচারি পয়সায় কিরূপ ভাবে বিক্রয় হইতে পারে তাহা সহজেই বুঝিবেন। এখন অন্যান্য জিনিসের মত কবিরাজী জিনিসেরও যে দাম বাড়িয়াছে, সে কথা বোধ হয় না বলিলেও চলিবে। সর্ব্বাপেক্ষা এই মোদকের প্রধান উপাদান সিদ্ধির মূল্য আগে ছিল তিনটাকা চারিটাকা সের, এখন সেই সিদ্ধির মূল্য দাঁড়াইয়াছে ২০৲ কুড়ি টাকা সের। এ অবস্থায় ইহা ফিরিওয়ালারা নাম মাত্র মূল্যে কেমন করিয়া বিক্রয় করিতে পারে তাহা পাঠকই অনুমান করুন।

তা' ছাড়া এই মোদক প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থায় শাস্ত্রে লিখিত আছে—

ভূতনাথে সুরপতৌ রতিনাথে তথৈবচ।
হুতভুক্তে গণনাথে মোদকাগ্রং নিবেদয়েৎ।
মূলমন্ত্রং সমুচ্চর্য্য হুতাশনে সমর্পয়েৎ॥
ততোঽভিমন্ত্রিতং। ওঁং হ্রীং শং সং অমৃতং
কুরু কুরু অমৃতে অমৃতোদ্ভবায় নমঃ হ্রীং
অমৃতং কুরুকুরু অমৃতেশ্বরায় স্বাহা ওঁং স্বাহা।
ইতি মন্ত্রেণাভিমন্ত্রিতং কৃত্বা পাত্রান্তরে
স্থাপয়েৎ॥

অর্থাৎ ভূতনাথ,সুরনাথ,রতিনাথ এবং গণনাথকে ইহার অগ্রভাগ নিবেদন করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া হুতাশনকে সমর্পণ করিবে। সত্য করিয়া বলিলে, এরূপভাবে অভিমন্ত্রিত করিয়া, ফিরিওয়ালার হস্তে ইহা বিক্রয়ের ব্যবস্থা কখনই হওয়া সম্ভবপর নহে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, নেশা করিবার উদ্দেশ্যে ইহা ক্রয় করিবার সময় সে সকল কথা বিচার করিবার কাহারও আবশ্যক হয় না।

এই মোদককটি আয়ুর্ব্বেদের রসায়ন ও বাজীকরণ অধিকারোক্ত ঔষধ। শাস্ত্র ইহার ফলশ্রুতিতে বলিয়াছেন,—

বিলাসার্থং প্রদোষে চ মোদকং পরিসেবয়েৎ।
ত্রিসপ্তাহ প্রয়োগেন কামান্ধো জায়তে নরঃ।
কামতুল্যং ভবেদ্রূপং স্বরঃ পরভৃতোপমঃ।
খগতুল্য ভবেদ্ দৃষ্টি বৃদ্ধোঽপি তরুণায়তে॥
বীর্য্য বৃদ্ধি করং শ্রেষ্ঠং জরা মৃত্যু বিনাশনম্।
অপস্মার জরোন্মাদ ভগ্নানিল গদাপহম্॥

কাসং খাসং সশোথঞ্চ ভগন্দর গুদাময়ম্।
অগ্নিমান্দ্যমতীসারং বিবিধং গ্রহণী গদম্॥
বহুমূত্রং প্রমেহঞ্চ শিরোরোগমরোচকম্।
হন্তি সর্ব্বান্ গদান্ ঘোরান্ বাতপিত্তবলাসজান্॥

অর্থাৎ ইহা দ্বারা জরা ও বার্দ্ধক্য জনিত নানাবিধ ব্যাধি আরোগ্য হইয়া থাকে। কথিত আছে, লঙ্কানাথ রাবণের মঙ্গল কামনায় দেবাদিদেব মহাদেব এই পরম কল্যাণকর মহৌষধের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। প্রকৃত কথা বলিতে কি, যদি খাঁটি ভাবে এই মহৌষধ প্রস্তুত করা হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রীয় ফল অনুযায়ী বহুবিধ ব্যাধিই ইহা দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে, কিন্তু যথাশাস্ত্র প্রস্তুত করিলে ইহা যে স্বল্প মূল্যে—নাম মাত্র মূল্যে, দুই পয়সা চারিপয়সা করিয়া বিক্রয় করা যায় না, তাহা অবিসংবাদিত সত্য।

আয়ুর্ব্বেদে শ্রীমদনানন্দ মোদক ভিন্ন কামেশ্বর মোদক এবং আরও অনেক প্রকার সিদ্ধি ঘটিত মোদক আছে। উহাদিগের প্রস্তুতের ব্যয় শ্রীমদনানন্দ মোদক অপেক্ষা অনেক কম। ঐ সকল মোদক প্রস্তুতে পরিশ্রমও কম হইয়া থাকে। বাজারের অনেক স্থলে কামেশ্বর মোদক বা ঐ জাতীয় কোনো মোদক শ্রীমদনানন্দের নামেও ফেরিওয়ালাদের হস্তে বিক্রয় হইয়া থাকে—এমন কথাও আমরা অবগত আছি। শ্রীমদনানন্দ মোদকের গুণের সহিত কামেশ্বর বা অন্য মোদকের গুণের যথেষ্ট পার্থক্যও বিদ্যমান। শ্রীমদনানন্দ অপেক্ষা ঐ সকল মোদকে মাদকতার শক্তি অনেক অধিক। সে জন্যও বটে এবং ব্যয়ের সঙ্কোচের জন্যও বটে—অনেক ব্যবসায়ী কামেশ্বর বা ঐ জাতীয় মোদককে শ্রীমদনানন্দ বলিয়া বিক্রয় করিয়া থাকেন। ফলে ঐ সকল মোদকে সিদ্ধির মাত্রা অধিক থাকায় আপাত মধুর সুখ বোধ হইলেও ইহার পরিণতি স্বাস্থ্য হানি। সর্ব্ব সময়েই মনে রাখা উচিত, যাহা উত্তেজক তাহাই পরিশেষে অবসাদক হইয়া থাকে। তা'ছাড়া বিনাকারণে সাধ করিয়াও ঔষধ সেবন কর্ত্তব্য নহে। জরা এবং বার্দ্ধক্যে যথাশাস্ত্র প্রস্তুত শ্রীমদনানন্দ মোদক সেবন কর—যথেষ্ট ফল পাইবে, কিন্তু যুবা বয়সে সখ করিয়া নেশার উদ্দেশ্যে ইহা কোনো ক্রমেই সেবন করা সমীচীন নহে; যিনি সে উদ্দেশ্যে ইহা সেবন করিবেন—তাঁহাকে যে পরিণামে অনুতাপ করিতে হইবে—সে কথা আমরা জোর করিয়াই বলিয়া রাখিতেছি।

বিবিধ-প্রসঙ্গ।

দেশীয় চিকিৎসা।—দেশীয় চিকিৎসার উন্নতি কল্পে, মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট তত্রত্য ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মহম্মদ ওসমান সাহেবের সভাপতিত্বে এক কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সংপ্রতি ঐ কমিটির রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। কমিটির সভ্যগণ ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে তথ্য সকল সংগ্রহ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন

যে,ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতিই ভারতবাসিগণের পক্ষে একান্ত উপযোগী। এই চিকিৎসা দ্বারা দরিদ্র ব্যক্তিরা যাহাতে অল্প মূল্যে ঔষধ পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। শল্য বিভাগেও যাহাতে ভারতীয় ঔষধ কার্য্যকারী হইতে পারে তজ্জন্য কমিটি গবর্ণমেন্টকে চেষ্টাশীল হইতে বলিয়াছেন। কমিটির প্রস্তাব—লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণের জন্য গবর্ণমেণ্ট অবিলম্বে দেশীয় ঔষধ প্রস্তুত বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করুন।

ক্যানসারে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা।—হায়দারাবাদের শ্রীযুক্ত সিদ্ধমোহন মিত্র বিলাতে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা করিয়া থাকেন। তিনি বিলাতের "বোরেন মাউথ ডেলি একো" নামক পত্রে লিখিয়াছেন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় ক্যান্সার রোগ অসাধ্য নহে, ইহা এই চিকিৎসায় সহজ সাধ্য এবং কোনোরূপ যন্ত্রণাদায়ক নহে। তিনি আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা দ্বারা এই রোগে বহুস্থলে ফল পাইয়াছেন। তিনি আরও লিখিয়াছেন, যদি কোনো ডাক্তার আয়ুর্ব্বেদ মতে এই রোগের ঔষধের তথ্য অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনি তাহার শিক্ষা দানে প্রস্তুত আছেন।

সর্প দংশনের ঔষধ।—"হিতবাদীতে প্রকাশ,—রিঠা নামক যে ফল বাজারে কাপড় কাচিবার জন্য বিক্রীত হয়, সর্প দষ্ট রোগীকে সেই রিঠা খাওয়াইয়া ঘুমাইতে না দিলে বিষ নষ্ট হইয়া যায়। যে পর্য্যন্ত রিঠার আস্বাদ মিষ্ট বলিয়া বোধ হইবে, সে পর্য্যন্ত শরীরে সর্পবিষ আছে বুঝিতে হইবে। রিঠার প্রকৃত আস্বাদ বোধ হইলেই বুঝিতে হইবে, শরীরে আর সর্প বিষ নাই। একটী শিমুল ফুল বৃন্ত সহিত খাওয়াইলেও নাকি সর্প বিষ নষ্ট হয়। যখন রোগী অচেতন হইয়া পড়ে, খাইবার সামর্থ্য থাকে না, তখনও যদি উক্ত শিমুল ফুল বৃন্ত সমেত কাটিয়া মলদ্বার দিয়া যন্ত্র যোগে (Injection) শরীরে যে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে রোগী অচিরে আরোগ্য লাভ করিবে।

দীর্ঘজীবী বাঙ্গালী।—বঙ্গের বারভূঁইয়ার অন্তর্গত বিক্রমপুরের স্বনামধন্য চাঁদরায়ের জনৈক বংশধর ঢাকা-তাজপুর নিবাসী অভয়াচরণ ভৌমিক মহাশয় ১১৯ বৎসর বয়সে গত ২রা চৈত্র তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন। এ দীর্ঘ বয়সেও তাঁহার স্বাস্থ্য অতি সুন্দর ছিল। মৃত্যুর এক ঘণ্টা পূর্ব্বে পর্য্যন্ত তিনি বসিয়া গীতা শ্রবণ করিয়াছিলেন। গ্রামস্থ বহু নরনারী এ দীর্ঘজীবীর শবদেহ দেখিতে আসিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর ভাগ্যে এরূপ সুস্থ শরীরে দীর্ঘ-জীবন লাভ করা প্রায়ই ঘটে না।—সম্মিলনী।

ছাত্রগণের স্বাস্থ্য।—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের চেষ্টায় ছাত্রগণের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ফলে প্রকাশ পাইয়াছে, শতকরা ৭১ জন ছাত্র কোনো না কোনো রোগে ভুগিতেছে। তাঁহারা স্কটিশচার্চ্চ, ইউনিভারসিটি, সিটি, প্রেসিডেন্সী, বিদ্যা-সাগর, সি, এম, এস এবং বঙ্গবাসী কলেজের ছয় হাজার ছাত্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। পাঠকগণ ইহা হইতেই দেশের অবস্থা অনুমান করিয়া লউন।

আয়ুর্ব্বেদ

৭ম বর্ষ } জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০ সাল। { ৯ম সংখ্যা।

বসন্ত-প্রতিকার।

(কবিরাজ শ্রীমথুরানাথ মজুমদার,

কাব্যতীর্থ, কবিচিন্তামণি)

—:o:—

(১) লক্ষণ ও প্রকার ভেদ

বসন্ত অতি ভীষণ সংক্রামক ব্যাধি। এই রোগের প্রতিকার কল্পে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে আর্য্য ঋষিদের যে সকল সহজলব্ধ নিরাময় ও আশু ফলপ্রদ মুষ্টিযোগ উপনিবদ্ধ প্রাপ্ত হওয়া যায়, এস্থলে তাহা পাঠকবর্গের পরিজ্ঞানার্থ বিবৃত করা যাইতেছে। শরীরে যে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটকের সমুৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহারই নাম বসন্ত বা মসূরিকা। হাম বা লুন্তি এবং জল বা পানি বসন্তও এই ভীষণ বসন্তরোগেরই অবান্তর ভেদ মাত্র।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে বসন্তরোগের উৎপত্তির কারণ বলিয়া যাহা যাহা উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই কারণ পরম্পরার মধ্যে কফ ও বায়ু অপেক্ষা পিত্তেরই অধিক প্রকোপ সংঘটিত হইয়া থাকে। অধিকন্তু বসন্তের নিদানের অন্তর্ভুক্ত সেই সেই পিত্তপ্রকোপকারক আহার ও ব্যবহার দ্বারা শরীরের রক্তেরও প্রদুষ্টি ঘটিয়া থাকে। এই সকল আনবার্য্য কারণপ্রাচুর্য্য বশতই ভীষণ বসন্তরোগের প্রাদুর্ভাব-কালে পিত্ত ও রক্তদুষ্টিকারক আহার ও ব্যবহার হইতে সর্ব্বতোভাবে প্রতি-নিবৃত্ত থাকা একান্ত কর্ত্তব্য।

পিত্ত বা রক্তদুষ্টি হইতে যে বসন্তরোগ জন্মিয়া থাকে, সুপ্রসিদ্ধ বঙ্গসেন প্রণীত আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থে তাহা এইরূপ উক্ত হইয়াছে ;—

"পিত্তং শোণিতসংস্পৃষ্টং যদা দূষয়তি ত্বচম্
তদা জায়ন্তে পিড়কাঃ সর্ব্বগাত্রেষু দেহিনাম্" ॥

রক্তের সহিত মিলিত পিত্ত ত্বক দুষ্ট করিয়া সকল শরীরে পিড়কা (স্ফোটক) জন্মাইয়া থাকে ও উহারই নাম বসন্ত বা মসূরিকা।

আয়ুর্ব্বেদে বাত, পিত্ত, কফ, রক্ত ও সান্নিপাত ভেদে পাঁচ প্রকার বসন্তের প্রধানতঃ সমুল্লেখ করা হইয়াছে। রোমান্তি (হাম

বা মুক্তি) কফ ও পিত্তজাত। রস, রক্ত, মাংস, মেদ, মজ্জা, অস্থি ও শুক্র সমাশ্রয় করিয়া, বাত, পিত্ত, ও কফ কর্ত্তৃক বসন্তরোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা হইলেও সকল প্রকার বসন্তে পিত্ত বা রক্তের প্রকোপই মুখ্য কারণ স্বরূপ হইয়া থাকে এবং উপরে তাহার প্রমাণ ও সমুল্লেখ করা গিয়াছে। এইরূপ রসকে সমাশ্রয় করিয়া যে নাতিভয় ও যন্ত্রণা-প্রদ সুখসাধ্য বসন্তরোগ উৎপন্ন হয়, সাধারণ্যে তাহাই "পান বা জল বসন্ত" নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

উল্লিখিত সকল প্রকার বসন্তের মধ্যে রসগত, রক্তজ-পিত্তজ, শ্লেষ্মজ ও পিত্ত-শ্লেষ্ম-জাত বসন্ত সুখসাধ্য বলিয়া শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। বাতজ, বাতপিত্তজ ও বাতশ্লেষ্মজ বসন্ত কষ্টসাধ্য অর্থাৎ কেবল সুচিকিৎসকের হাতে পড়িলেই এইরূপ রোগগ্রস্ত ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা পাইতে পারে। বাত, পিত্ত ও কফ এই দোষত্রয়ের সন্নিপাত বশতঃ সঞ্জাত বসন্ত এবং মেদ, মজ্জা, অস্থি ও শুক্রগত বসন্তরোগ একেবারেই অসাধ্য—অর্থাৎ এই সকল বসন্তরোগে যথারীতি সুচিকিৎসা ও শুশ্রূষা করিলেও কিছুতেই রোগের উপশম হয় না, প্রত্যুত রোগীর জীবনান্তই ঘটিয়া থাকে।

বসন্ত অতি ভয়ানক জীবনহন্তারক ব্যাধি বলিয়া ইহার চিকিৎসা বিষয়ে প্রসিদ্ধ ভাব-প্রকাশ গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে,—

'বহবো ভিষজো নাত্র ভেষজং যোজয়ন্তি হি।
কেচিৎ প্রযোজয়ন্ত্যেব.................... ॥'

সাধ্য ও অসাধ্য বিবেচনা করিয়া, বসন্ত রোগে ঔষধ প্রয়োগ বিষয়ে চিকিৎসকবৃন্দের মতদ্বৈধ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। একশ্রেণীর চিকিৎসক বলেন, এই রোগে কোন প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। আবার অপর চিকিৎসকেরা বলেন, যখন মানবের মঙ্গল সাধন সমুদ্দেশেই রোগে চিকিৎসা পদ্ধতি প্রকটিত হইয়াছে, পরিণামে শুভ বা অশুভ—যেরূপই ঘটুক না কেন, রোগে অবশ্যই তাহার চিকিৎসা যথাবিধি করা আবশ্যক। এই মতই সর্ব্বথা অবলম্বনীয়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ভাবপ্রকাশ গ্রন্থে আরও সমুদ্দিষ্ট হইয়াছে,—

কশ্চিদ্বিনাপি যত্নেন সিদ্ধন্ত্যাশু মসূরিকাঃ।
দৃষ্টাঃ কৃচ্ছ্রতরাঃ কশ্চিৎ কশ্চিৎ
সিদ্ধন্তিবা ন বা।
কশ্চিন্নৈব তু সিধ্যন্তি সাধ্যমানাঃ প্রযত্নতঃ ॥'

কোন কোন প্রকার বসন্ত বিনা চিকিৎসাতেও আপনি শীঘ্র উপশম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কোন কোন বসন্ত কখনও বা উপশম প্রাপ্ত হয়, আবার কখনও বা কিছুতেই শান্তি প্রাপ্ত হয় না। আবার কোন কোন বসন্ত যথারীতি চিকিৎসিত হইলেও কিছুতেই উপশমিত হয় না।

শাস্ত্রে রোগের চিকিৎসা বিষয়ে যে প্রকার ভেদ বর্ণিত হইয়াছে কার্য্যতও সেই-রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন চিকিৎসক বসন্ত রোগের চিকিৎসা করিয়া থাকেন; আবার কেহ কেহ বা ঐ রোগের নিকটে অবস্থিতি করাও বাঞ্ছনীয় মনে করেন না। অপরদিকেও দেখা যায়, অনেক বসন্তরোগ বিনা ঔষধে আপনা আপনিই অতি অল্প দিন মধ্যে উপশম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভাগ্য-ক্রমে এই শ্রেণীর কোন বসন্ত রোগীকে

আপনার অধিকার মধ্যে পাইয়া, তাহার চিকিৎসক লোকসমাজ হইতে অতিরিক্ত ধন্যবাদ লাভ করিয়া আপনাকে বাস্তবিক কৃতার্থ মনে করিয়া থাকেন।

বসন্তরোগ আরোগ্য হওয়ার পরেও যদি সেই ব্যক্তির কূর্পর মণিবন্ধ অথবা অংশফলকে শোথ জন্মে, তবে তাহাও অসাধ্য বলিয়াই পরিগণিত হইয়া থাকে।

এস্থলে মোটামুটিভাবে লক্ষণ ও সাধ্যাসাধ্যের কথা উল্লেখ করিয়া মুষ্টিযোগ মতে সংক্ষেপে রোগের চিকিৎসা বিবৃত করা যাইতেছে।

(২) অনাগত প্রতিষেধ

যে সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান রোগ প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে করিলে আর শরীরে ব্যাধির (এস্থলে বসন্তরোগের) আক্রমণের সম্ভাবনা দূর হইয়া যায়, তাহারই নাম অনাগত প্রতিষেধ।

(ক) 'শিবাস্থি' ধারণ করা—এই শ্রেণীর উপদেশ। এস্থলে শিবাস্থি শব্দে কেহ কেহ বলেন, শিবা অর্থাৎ হরীতকী, তাহার অস্থি বা আঁটি,—তাহাই ধারণ করা বিধেয়। বসন্তরোগের নিবারণ কল্পে হরীতকীর আঁটি ধারণ করিতে বৃদ্ধ বৈদ্যগণের উপদেশ প্রসিদ্ধ আছে। আবার অন্য কেহ বলেন, শিবাস্থি শব্দে শৃগালের অস্থি। রুদ্রাক্ষও বসন্তরোগের প্রতিষেধক, এই জন্য কেহ কেহ বলেন, শিবাস্থি নহে—শিবাক্ষ অর্থাৎ রুদ্রাক্ষ. ইহার ধারণও বসন্তরোগের প্রতিষেধক। সুতরাং এইরূপ ব্যবহারও সমীচীন বলিয়াই বোধ হয়।

(খ) ডাবের জলে আতপ চাউলের ভাত খুব বিশুদ্ধভাবে রান্না করিয়া উহার দুই তিন গ্রাস তিন বা সাত দিন কাল—আহার করিবার ব্যবস্থা। প্রথমে উহা খাইবার জন্য একটি সাধু জনৈক ভদ্র বর্দ্ধিষ্ণু মহিলাকে উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই ঐরূপ ব্যবহার সেই বংশে প্রচলিত থাকিতে দেখা গিয়াছে।

(গ) চৈত্র মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথিতে একটি নূতন মাটির কলসীতে চূণ মাখাইয়া রক্তবর্ণ পতাকার সহিত তাহাতে সুহী (মনসাসিজ) বৃক্ষ রোপন করিয়া রাখিয়া দিলে, বসন্তরোগের বা অন্য সংক্রামক পীড়ার আক্রমণ নিবারিত হইয়া থাকে। অনেক স্থলে ঐরূপ সুহী বৃক্ষ রোপণ করিতে এখনও দেখা গিয়া থাকে। দ্রব্যে অন্তর্নিহিত কি অলৌকিক শক্তি বর্ত্তমান, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তবে এইরূপ ব্যবহার যে সুপ্রাচীন ঋষিযুগেও বর্ত্তমান ছিল, প্রসিদ্ধ চরকসংহিতায় দ্রব্যের প্রভাব শক্তির বর্ণনা প্রসঙ্গে তাহার উল্লেখে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়,—

'বিষং বিষঘ্নমুক্তং যৎ প্রভাবস্তত্র কারণম্।
ঊর্দ্ধানুলোমনং যচ্চ তৎপ্রাবভপ্রভাবিতম্॥
মণীনাং ধারণীয়ানাং কর্ম্ম যদ্ বিবিধাত্মকম্।
তৎপ্রভাবকৃতং তেষাং প্রভাবোঽচিন্ত্য উচ্যতে

কোন দ্রব্যের যে সকল গুণ বর্ত্তমান আছে বলিয়া শাস্ত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা হইতে অতিরিক্ত শক্তি সেই দ্রব্যের না থাকিলেও যেখানে অচিন্ত্য দ্রব্য-শক্তি বশতঃ সেইরূপ কার্য্যান্তরের সংঘটন হইতে দেখা যায়, তাহাকেই ঐ দ্রব্যের 'প্রভাব' বলিয়া

শাস্ত্রে অভিহিত করা হইয়াছে। এক বিষ যে শাক্ত বলে অন্তর্বিষ বিষের ক্রিয়া বিনষ্ট করিতে সমর্থ হয় এবং উর্দ্ধগামীও হয়, উহাই তাহার প্রভাবকৃত বলিয়া নির্ণয় করিতে হইবে। মণি বিশেষ ধারণ বশতঃ যে নানা বিধ অলৌকিক ব্যাপার সংঘটিত হয়, তাহাও প্রভাবের প্রভাব বশতই সম্পন্ন হইয়া থাকে।

(৩) সংশোধন ক্রিয়া

বসন্তরোগ উৎপন্ন হইলে, রোগীর ও রোগের বলাবল বিবেচনা পূর্ব্বক, অগ্রেই সংশোধন ক্রিয়া করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বমন ও বিরেচন প্রভৃতি ক্রিয়াকেই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে সংশোধন ক্রিয়া বলা হইয়া থাকে। রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বেও নিজ শরীরের অবস্থা ভালরূপে বুঝিয়া জোলাপ নিলে, আর রোগ হওয়ার ভয় থাকে না।

বসন্তের প্রথম অবস্থাতে পলতা, নিমছাল বাসক পাতার কাথ প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে বচ, ইন্দ্রযব, যষ্টিমধু ও ময়নাফল চূর্ণ যথোচিত মাত্রায় মিশ্রিত করিয়া পান করাইলে বমন হইয়া শরীরের দোষ কমিয়া থাকে।

বমন করাইলেও যদি এইরূপ বুঝা যায় যে, রোগীর শরীর হইতে দোষ সমূহ সম্পূর্ণ-রূপে নিঃসারিত হইয়া যায় নাই, সেই অবস্থাতেই তাহা হইলে তাহাকে যথোপযুক্ত বিরেচন প্রদান করা কর্ত্তব্য।

রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে, সংশোধক ঔষধ অর্থাৎ বমন বিরেচক ঔষধ না দিয়া, তাহাকে অবস্থা বিবেচনা পূর্ব্বক দোষের অর্থাৎ বাত, পিত্ত ও কফের শমনকারক ঔষধ প্রদান করিতে হইবে। সংশোধন ক্রিয়ার দ্বারা দোষের লাঘব হইয়া পড়িলে, বসন্তে কোনরূপ বিকার থাকে না, বেদনায় লাঘব হয়, ব্রণ সমূহ শীঘ্রই পাকিয়া উঠে তাহাতে অল্প পরিমাণ পূয জন্মিয়া থাকে।

(৪) রোগের উপক্রমে

বসন্তরোগের প্রথম অবস্থাতে কুমরিয়া লতার কাথ প্রস্তুত করিয়া উহাতে দুই আনা মাত্রায় হিং প্রক্ষেপ দিয়া পান করা কর্ত্তব্য। শেয়াল কাঁটার মূল বাসি জল দ্বারা বাটিয়া সেবন করাইলেও বসন্তের প্রতিকার হইয়া থাকে।

হলুদের পাতা যথোপযুক্ত মাত্রায় লইয়া বাটিয়া শীতল জলের সহিত সেবন করাইলেও রোগের উপকার হয়।

(৫) রোগ বৃদ্ধির আশঙ্কা পরিহার—

শাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন, শরীরে সর্ব্ব প্রথমে বসন্তরোগ উৎপন্ন হওয়া মাত্র, সেই অবস্থাতে যে কয়েকটি বসন্তের স্ফোটক দৃষ্ট হইবে, পীড়িত ব্যক্তির নাম উল্লেখ পূর্ব্বক সেই কয়েকটি চালিতা পাতা ছিন্ন করিয়া ফেলিলে, আর বেশী ফোড়া হইবার আশঙ্কা থাকে না।

(৬) বসন্তে রস প্রয়োগ

শোধিত গন্ধক দুইভাগ এবং শোধিত রস একভাগ দ্বারা কজ্জলী প্রস্তুত করিয়া, তাহা যথোপযুক্ত মাত্রায় পানের রস সহ সেবন করাইলে বসন্তের প্রতিকার হইয়া থাকে।

(৭) বসন্তে দাহ নিবারণ

বসন্তরোগ নিবন্ধন শরীরের দাহ উপস্থিত হইলে, বাসি জলের সহিত উপযুক্ত পরিমাণে মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে, দাহ নিবারিত হইবে। অধিকন্তু এই মধু মিশ্রিত

জল পান দ্বারা বসন্তরোগেরও উপশম হইয়া থাকে।

(৮) কায় শোধন

চালিতার ছাল দ্বারা শীতকষায় প্রস্তুত করিয়া ঐ কাথ দ্বারা শরীর ধৌত করিলে, বসন্তের ক্লেদ বিদূরিত হইবে। পাচন প্রস্তুত করার নিয়মে পূর্ব্বদিনে কষায় প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া পরদিন, উহা ব্যবহার করিতে হয়। এইরূপ কাথকেই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে শীতকষায় বলা হইয়া থাকে। এস্থলে বড়ঙ্গ পানীয় বিধানেই ধৌত করাইবার জন্য শীতকষায় প্রস্তুত করা বিধেয়।

(৯) ধূপ

বচ, বাঁশের নেলি, যব, বাসকমূলের ছাল, কাপাস বীজ, ব্রাহ্মীশাক, তুলসীপাতা, আপাংবীজ, লাক্ষা ও ঘৃত-সহযোগে ধূপ প্রদান করিলে, সকল প্রকার বসন্ত ও অন্যবিধ ব্রণরোগেরও উপশম হইয়া থাকে। কাহারও কাহারও মতে এস্থলে ধূমদ্রব্যের সহিত বিষ প্রদান করাও কর্ত্তব্য;—কিন্তু বিজ্ঞ প্রবীণ আয়ুর্ব্বেদাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বসন্তরোগের সকল অবস্থাতেই কোন প্রকারে বিষের সম্পর্ক রাখা—রোগীর জীবনের পক্ষে হিতজনক নহে, এই কথা দৃঢ়তার সহিত বলিয়া গিয়াছেন।

(১০) কষায় ব পাচন ব্যবস্থা

নিমছাল, ক্ষেতপাপড়া, আকনাদি, কট্‌কি, পলতা, বাসকমূলের ছাল, দুরালভা, আমলা, বেণার মূল, রক্তচন্দন ও শ্বেতচন্দন,—এই সকল দ্রব্য যথোপযুক্ত মাত্রায় সমভাগে লইয়া কাথ প্রস্তুত করিয়া উহাতে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইলে, জ্বর ও বিসর্পযুক্ত ত্রিদোষ জাত বসন্তরোগেরও শান্তি হইয়া থাকে। বসন্তের গুটি বসিয়া গেলে, এই পাচন ব্যবহারে তাহা পুনরায় বাহিরে প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই পাচনটি সকল প্রকার বসন্তরোগেই বিশেষ ফলপ্রদ ও নিরাপদ বলিয়া আমাদের অধ্যাপক পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় ৺দ্বারকানাথ সেন কবিরত্ন মহাশয় ইহা বিশেষরূপে ব্যবহার করাইতেন।

(১১) শীঘ্র পাকাইবার উপায়—

টাবা লেবুর কেশর কাঁজি দ্বারা বাটিয়া প্রলেপ দিলে শীঘ্রই বসন্তের গুটিকাগুলি পাকিয়া উঠে, এবং উহাতে দাহও নিবারিত হইয়া থাকে।

(১২) পাদদাহ নিবারণ।

পদদ্বয়ে উৎপন্ন বসন্তসমূহ অত্যন্ত দাহ জন্মাইয়া থাকে। চেলেনি জল দ্বারা বারংবার পা ধুইলে, সেই দাহ দূর হয়।

(১৩) পক্কাবস্থায় ব্যবস্থা।

বসন্তের পক্কাবস্থায় বায়ুর প্রকোপ অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, এইজন্য বসন্তের এই অবস্থাতে বিশোধন অর্থাৎ রুক্ষক্রিয়া করা কোনমতেই এই রোগ নিপীড়িত ব্যক্তির পক্ষে শুভজনক হয় না;—প্রত্যুত এইরূপ অবস্থাতে সংবৃংহণ অর্থাৎ পুষ্টিকারক ক্রিয়ার অনুষ্ঠানই পীড়িত ব্যক্তির জীবন কামনায় সুচিকিৎসকের কর্ত্তব্য।

এই পক্ক অবস্থাতে গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, কিস্‌মিস্ ইক্ষুমূল ও দাড়িমছালের কাথে উপযুক্তরূপে ইক্ষুগুড় প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইলে শীঘ্রই বসন্তের স্ফোটকগুলি পাকিয়া উঠে এবং বায়ুরও শান্তি হইয়া থাকে।

(১৪) মাংসরস ব্যবস্থা।

বসন্তের পর অবস্থাতে রুক্ষক্রিয়া নিবন্ধন বায়ুর অত্যন্ত প্রকোপ হইয়া পড়িলে, সেই অবস্থাতে পীড়িত ব্যক্তির শূলবেদনা, আধ্মান (পেট্‌ফাঁপা) এবং কম্প প্রভৃতি বায়ুজাত উপদ্রবসমূহ জন্মিয়া থাকে। এই অবস্থাতে চাতক ও তিত্তির প্রভৃতি পাখীর মাংসরস অল্পমাত্রায় সৈন্ধব সহযোগে প্রদান করা কর্ত্তব্য।

(১৫) অরুচি।

বসন্তরোগে অরুচি হইলে, অম্লদাড়িমের রসের সহিত মুগ, বা মসুরির যূষ পান করিলে, বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। খয়ের এবং পীতশাল দ্বারা সাধিত শীতলকাথ পানেও অরুচি দূর হয়।

(১৬) শৌচ।

খয়ের কাষ্ঠ ও চালিতাছালের ষড়ঙ্গপানীয় বিধানে অর্দ্ধেক জল শুকাইয়া সেই কাথ বসন্তরোগে শৌচক্রিয়ার জন্ত ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

(১৭) মুখ ও কণ্ঠরোগে।

জাতীপত্র, মঞ্জিষ্ঠা, দারুহরিদ্রা, সুপারি, শমীকাঠ, আমলা ও যষ্টিমধু দ্বারা কাথ প্রস্তুত করিয়া শীতল অবস্থাতে তাহার সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া, মুখ ও কণ্ঠরোগে গণ্ডুষ ধারণ করিলে বিশেষ উপকার হইবে।

(১৮) চক্ষুঃ রোগে—

শুলফ ও যষ্টিমধু জলের সহিত বাটিয়া লইয়া, বস্ত্রদ্বারা পুটলি বাঁধিতে হইবে। ঐ পুটলি ঈষৎ নিপীড়িত করিয়া চক্ষুতে সেক দেওয়া কর্ত্তব্য।

যষ্টিমধু, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, সূচমুখী, দারুহরিদ্রা, নীলোৎপল (সুঁদি) বেণারমূল, লোধ ও মঞ্জিষ্ঠা, এই সকল দ্রব্য মিলিতভাবে অথবা পৃথকভাবে এক একটির যথালাভ গ্রহণ করিয়া প্রলেপ অথবা কাথ দ্বারা অভিষেক করিলে নয়নগত বসন্তের উপশম হয় এবং ফোড়া গলিয়া গিয়া চক্ষুর অনিষ্ট ঘটিবার কোন আশঙ্কা হইতে পারে না।

(১৯) পূঁয হইলে তাহার প্রতিকার—

বসন্তের স্ফোটকে পূঁজ হইলে বট, অশ্বত্থ, পাকুড়, যজ্ঞডুমুর ও বকুলের ছাল চূর্ণ তাহাতে ব্যবহার করা বিধেয়। ঘুঁটের ছাই অথবা শুষ্ক গোবর চূর্ণ পূর্ব্বোক্তরূপে ক্লেদ নিবারণের জন্ত প্রয়োগ করা বিহিত।

(২০) ক্রিমি নিবারণ—

বসন্তের স্ফোটকে ক্রিমি উৎপন্ন হইবার আশঙ্কা নিবারণের জন্ত সরল, অগুরু ও গুগ্‌গুলু প্রভৃতি দ্বারা বেশ ধূপ প্রদান করা কর্ত্তব্য। কারণ এইরূপ ধূপ ব্যবহার দ্বারা আতুরের বেদনা ও দাহের শান্তি হয় এবং পূঁয নির্গত হইয়া স্ফোটকগুলিও বিশুদ্ধ হয়, অধিকন্তু ক্রিমি জন্মিতে পারে না এবং শীঘ্রই পীড়া আরোগ্য হইয়া থাকে।

(২১)। কণ্ঠশুদ্ধি

এই রোগে গলায় শ্লেষ্মার প্রকোপ দৃষ্ট হইলে পিপুল ও হরীতকী চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিতে দিবে। কণ্ঠশুদ্ধির জন্ত অষ্টাঙ্গাবলেহ অথবা আদার কবল ব্যবহার করাও বিহিত।

(২২) স্নেহ প্রয়োগ

বসন্তরোগের পান, অভ্যঞ্জন ও ভোজ্য-দ্রব্যের সহিত পঞ্চতিক্ত ঘৃত ব্যবহার করা

কর্ত্তব্য। ব্রণরোগে অন্ত যে সকল প্রয়োগ বিহিত হইয়াছে। ইহাতে সে সকলও বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যবহার করা আবশ্যক, কিন্তু বসন্ত রোগে তৈলের ব্যবহার সর্ব্বথা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হইবে। প্রাচীন ও প্রবীণ বিচক্ষণ আয়ুর্ব্বেদ আচার্য্যগণ সকলেই একবাক্যে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন, যথা,—

'পঞ্চতিক্তং প্রযুঞ্জীত পানাভ্যঞ্জনভোজনৈঃ।
কুর্য্যাদ্ ব্রণবিধানঞ্চ তৈলাদীন্ বর্জ্জয়েচ্চিরম্ ॥'

অধিকন্তু—

বাতং স্বেদং শ্রমং তৈলং গুর্ব্বন্নং ক্রোধমাতপম্।
কটুন্নং বেগরোধঞ্চ মসূরিগদবাংস্ত্যজেৎ ॥

মসূরিপীড়াক্রান্ত ব্যক্তি (বাহিরের) বাতাস বর্জ্জন করিবে; কোনরূপ স্বেদ (অগ্নির উত্তাপ) ও আতপ (রৌদ্র) গ্রহণ করিবে না; তৈল ব্যবহার করিবে না; গুরুপাক, কটু (ঝাল) বা অম্লদ্রব্য আহার করিবে না; ক্রোধের বশীভূত হইবে না এবং মল ও মূত্রাদির বেগ ধারণ করিবে না।

(২৩) রক্ত মোক্ষণ।

বসন্তরোগে রক্তের বিকৃতি পরিলক্ষিত হইলে, অবস্থা বিশেষে রক্তমোক্ষণ করাও বিহিত।

(২৪) গাত্রের দুর্গন্ধ নিবারণ।

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বেণারমূল, শিরিষ-পুষ্প, মুতা, লোধ, শ্বেতচন্দন ও নাগকেশর—উপযুক্ত মাত্রায় সমান ভাগে লইয়া বাটিয়া শরীরে মাখিলে বসন্তের দুর্গন্ধ নিবারিত হয়। এই প্রয়োগটির দ্বারা বিস্ফোট, বিসর্প, কুষ্ঠ, ও গাত্র দুর্গন্ধ প্রভৃতি নিবারিত হইয়া থাকে।

(২৫) পথ্য ও অপথ্য

ভাব প্রকাশ বলেন ;—

'মসূরিকাসু ভুঞ্জীত শালীন্ মুদ্গমসূরিকান্।
রসং মধুরমেবান্নাৎ সৈন্ধবং চাল্পমাত্রকম্ ॥'

বসন্তরোগে হৈমন্তিক ধান্তের অন্ন, মুগ ও মসুর ডাইল, মধুর রস বিশিষ্ট দ্রব্য সমূহ এবং অল্প পরিমাণে সৈন্ধব লবণ সেবন করিবে।

অধিকন্তু বাত, পিত্ত ও কফের সংস্রব অতিশয় বিচক্ষণতার সহিত লক্ষ্য করিয়া নিম্ন লিখিত দ্রব্যগুলিও পথ্যস্বরূপে ব্যবহৃত হইলে, বসন্তরোগের উপশম হইয়া থাকে।

পুরাতন যেটে ধান, আমন ধান, যব, ছোলা, মুগ, মসুর ডাইল; প্রতুদ জাতীয় অর্থাৎ পায়রা, ঘুঘু, চড়াই, জলকুক্কুট ও ডাহুক প্রভৃতির মাংস, করলা, উচ্ছে, নিম, কাকরোল, সজিনা ও পটোল প্রভৃতি তরকারি কুল, কিস্‌মিস্ ও ডালিম এবং এতদ্ভিন্ন মেধাবর্দ্ধক ও পুষ্টিকারক অন্ন ও পানীয় অন্যান্য দ্রব্য বসন্তরোগে সুপথ্য।

সংক্ষেপে বসন্তরোগের প্রতিকার কারক কতিপয় মুষ্টিযোগ এই প্রবন্ধে প্রকটিত করার জন্য চেষ্টা করা গিয়াছে। ইহাদ্বারা মানবের জীবন সুরক্ষিত হইলেই সেই প্রচেষ্টা সফলতা লাভ করিবে। সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবান সকলেরই মঙ্গল বিধান করুন, ইহাই প্রবন্ধ লেখকের আত্মনিবেদন।

বৃশ্চিক দংশন চিকিৎসা।

(শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়)

পল্লীগ্রামে সর্পভয় যেমন, বৃশ্চিক দংশনের ভয়ও তদ্রূপ আছে। কলিকাতা সহরেও বৃশ্চিক দংশনের ভয় অধিক পরিলক্ষিত হয়। বৃশ্চিকদষ্ট ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য কয়েকটি প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

বৃশ্চিকের বিষ প্রথমে অগ্নির ন্যায় দাহ এবং বিদারণবৎ পীড়া উৎপাদন করিয়া দ্রুতবেগে উর্দ্ধে গমন করে। তৎপরে দষ্টস্থানে প্রত্যাগত হইয়া অবস্থিতি করিয়া থাকে।

সদ্যঃপ্রাণহর বৃশ্চিকে দংশন করিলে, মানব-হৃদয়ের নাসিকার ও জিহ্বার কার্য্য রহিত হয়। দষ্টস্থানের মাংস খসিয়া পড়ে।

"তেঁতুলে বিছা" কামড়াইলে দুইটি মাত্র দন্তচিহ্ন, "কাঁকড়া বিছা" কামড়াইলে একটিমাত্র দংশন চিহ্ন পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু অনেক সময় সর্পাঘাত এবং বিছার দংশন প্রভেদ করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে। সর্প ছোবল মারিয়া দংশন করে, বিছায় ছোবল মারিতে পারে না, তবে কোন উচ্চস্থান হইতে পড়িয়াই কামড়াইতে পারে।

বিছা অত্যন্ত জোরে কামড়াইলে রক্ত পড়িতে পারে, সর্পদংশনে প্রায়ই রক্তপাত হয় না। বৃশ্চিকদষ্ট স্থানে কোন প্রকার লালা লাগিয়া থাকিতে দেখা যায় না, সর্পদষ্ট স্থানের চতুষ্পার্শ্বে সর্পমুখনিঃসৃত লালা লাগিয়া থাকিতে পারে। সর্প বৃহৎ হইলে উহার দন্তক্ষত যেরূপ বৃহৎ ও গভীর হয়, বৃশ্চিক দংশনাঘাত তদ্রূপ গভীর হওয়া অসম্ভব। বিছা কামড়াইলে দন্তাঘাত অত্যল্পকাল মধ্যে মিলাইয়া যায়, সাপে কামড়াইলে দষ্ট স্থানের চারি পার্শ্ব নীলারক্ত হয় এবং তাহা অল্প পরিমাণে ফুলিয়া উঠে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তাহা আবার কমিয়া যায়। বিছা কামড়াইলে শীঘ্রই সেই স্থান অত্যন্ত ফুলিয়া উঠে এবং তাহার চতুর্দ্দিক লালাযুক্ত হইয়া থাকে।

ক্ষতস্থানে হুল বিঁধিয়া থাকিলে নখ বা সূক্ষ্মমুখ (সোন্না) অথবা চাবিকাঠি বা লৌহ চোঙ্গ চাপ দ্বারা তাহা তুলিয়া ফেলিয়া ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত।

১। বৃশ্চিকদষ্টস্থানে অগ্রে গুগগুলুর ধূম লাগাইয়া, পরে তাহাতে আকন্দপাতা বাটিয়া প্রলেপ দিবে কিংবা উহার আঠা লেপন করিবে।

২। কালকাসুন্দার ডাটার নল নির্ম্মাণ করিয়া কর্ণে ফুৎকার দিলে বৃশ্চিকবিষ শীঘ্র নিবারিত হয়।

৩। উষ্ণ গব্যঘৃত, সৈন্ধব লবণ ও গন্ধক মিশ্রিত করিয়া দষ্ট স্থানে লেপন করিলে বৃশ্চিক বিষ নষ্ট হয়।

৪। কৃষ্ণ তুলসীর মূল বাটিয়া গুড়িকা করিবে। পরে সেই গুড়িকা দষ্টস্থানে বুলাইলে বিষ নষ্ট হয়।

৫। জীরা বাটিয়া ঘৃত ও সৈন্ধব লবণের সহিত মিশ্রিত করিবে, পরে অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া মধুর সহিত দষ্টস্থানে প্রলেপ দিলে বিষ নষ্ট হয়।

৬। হাতিশুঁড়া গাছের রস—বাহ্য ও আভ্যন্তর প্রয়োগে বিষ নিবারিত হয়। এক ছটাক সেব্য।

৭। হুড়হুড়ে গাছের পাতা মর্দ্দন করিয়া তাহার আঘ্রাণ লইলে বৃশ্চিকদষ্ট ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ নির্ব্বিষ হয়।

৮। পাকা কাঁঠালি কলা চটকাইয়া দষ্ট স্থানে প্রলেপ দিলে অভাবে কাঁচাকাঁঠালি কলা বাটিয়া দষ্টস্থানে প্রলেপ দিলেও যন্ত্রণার উপশম হয়।

৯। বকুল বীজ—জলসহ পাথরে ঘর্ষণ করিয়া চন্দনবৎ হইলে দংশিত স্থানে প্রলেপ দিলে তৎক্ষণাৎ জ্বালা-যন্ত্রণার নাশ হয়।

১০। শুণ্ঠী (শুঁঠ) পেষণ করিয়া নস্য লইলে বৃশ্চিক বিষ নষ্ট হয়।

১১। আমড়া ছাল বা উহার কচিপাতা বাটিয়া দষ্টস্থানে প্রলেপ দিলে কিম্বা ঐ গাছের পাতার রস ছাঁচি গুড় সহ মিশ্রিত করিয়া দষ্টস্থানে লাগাইলে জ্বালা-যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

১২। সাদা ভেরেণ্ডার আঠা দষ্ট স্থানে পুনঃ পুনঃ লাগাইলে জ্বালা নিবারিত হয়। উক্ত আঠা পুষ্করিণীর ঝিনুকে বা কাল কচুপাতায় রাখিবে, অন্য পাত্রে রাখিবেনা। ইহা পরীক্ষিত।

১৩। কাঁটা শাকের শিকড়ের রস পুনঃ পুনঃ লাগাইলে সত্বর জ্বালা উপশমিত হয়।

১৪। তামাকের গুড় দষ্টস্থানে লাগাইলে জ্বালা নিবারিত হয়।

১৫। বুড়িগোপন (মুষাকানী) পাতার রস দষ্ট স্থানে পুনঃ পুনঃ লাগাইলে জ্বালা নিবারিত হয়।

১৬। ছোট পেঁয়াজের রস দষ্টস্থানে বারম্বার লাগাইলে "বিছুর" দংশন জনিত জ্বালা-যন্ত্রণা ও বিষ নষ্ট হয়।

১৭। আলকুশী বীজ জলে ঘসিয়া দষ্ট-স্থানে দিলে "কাঁকড়া বিছার" কামড়ের জ্বালা-যন্ত্রণা ও বিষ নষ্ট হয়।

১৮। হুঁকার কাইট (তামাক খাইলে নলিচার মধ্যে যে ময়লা হয়) দষ্টস্থানে পুনঃ পুনঃ লাগাইলে যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

১৯। তার্পিন তৈল দষ্টস্থানে বারম্বার লাগাইলে জ্বালা নিবারিত হয়।

২০। হিং—জলে গুলিয়া চন্দনবৎ হইলে দষ্ট স্থানে বারম্বার লাগাইলে জ্বালার উপশম হয়।

২১। ছাগল নাদি জলে গুলিয়া দষ্টস্থানে প্রলেপ দিলে জ্বালা-যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

২২। পাথুরিয়া কয়লা জল দিয়া ঘসিয়া চন্দনের মত হইলে দষ্টস্থানে লাগাইলে যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

২৩ গোময় (গোবর) উষ্ণ করিয়া দষ্ট-স্থানে প্রলেপ দিলে বিষ নষ্ট হয় ও জ্বালা নিবারিত হয়।

২৪। লবণ—জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া অগ্নিতে ফুটাইয়া ঐ জল দ্বারা প্রদাহিত স্থানে ফোমেণ্টেশন করিলে জ্বালা-যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

২৫। ফটকিরি ১ খণ্ড—চিমটা দ্বারা

অগ্নি শিখায় ধারণে গলিয়া উঠিবে, সেই সময় দষ্টস্থানে ঐ উত্তপ্ত ফটকিরির ছ্যাকা প্রদান মাত্র প্রাণ বিয়োগ সদৃশী যাতনা হইলেও তৎক্ষণাৎ নিবারিত হইবে, পুনঃ পুনঃ ছ্যাকা দিবে। ইহা পরীক্ষিত; "কাঁকড়া বিছা" দংশনের যন্ত্রণা তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয়।

২৭। হরিদ্রা বাটা—দষ্টস্থানে প্রলেপ ও গাত্রে মাখিলে বিছার কামড়ানির জ্বালা নিবারিত হয়।

২৮। কর্ক বা ছিপী ভস্ম করিয়া তাহাতে চুণ মিশ্রিত করিয়া দষ্টস্থানে প্রলেপ দিলে যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

২৯। ধুনো—সরিষা তৈলের সহিত উত্তমরূপে ফেনাইয়া দষ্টস্থানে লাগাইলে জ্বালা নিবারিত হয়।

৩০। কালকচুর আঠা বা ঐ পাতার রস দষ্ট স্থানে দিলে জ্বালা নিবারিত হয়। বন্ত ওলের পুলটিশ লাগাইলে জ্বালার উপশম হয়।

৩১। কেঁচোর মাটি দষ্টস্থানে প্রলেপ দিলে যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

৩২। খাঁটি শুড্ডুক তামাক—জলে গুলিয়া ছাঁকিয়া লইবে, পরে রোগীর যে অঙ্গে বিছা কামড়াইয়াছে সেই অঙ্গের বিপরীত কর্ণের মধ্যে উক্ত দ্রব্য ৪।৫ ফোঁটা দিলে জ্বালা-যন্ত্রণার নিবারণ হয়। ইহা পরীক্ষিত।

৩৩। কচি কয়েতবেলের পাতা বাটিয়া দষ্টস্থানে প্রলেপ দিলে জ্বালা-যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

৩৪। পুকুরের বড় পানা বাটিয়া দষ্টস্থানে দিলে জ্বালা নিবারিত হয়।

৩৫। ইংরাজী ১৮৪০ সালের রাণীমুখ টাকা—মুখের লালা (থুতু) দিয়া দষ্টস্থানে বসাইয়া দিবে। তাহা হইলে জ্বালা যন্ত্রণা ও বিষ নিবারিত হইবে। ইহা পরীক্ষিত।

বৈদ্যরাজ।

[শ্রীরাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ]

—:*:—

প্রবন্ধের শিরোভাগে নাম দেখিয়াই অনেকে হয়ত মনে করিবেন, আমি কোন বৈদ্যকুলশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির জীবনী লিখিতেছি, ফলে তাহা নহে। "বৈদ্যরাজ" নামে কোন বৃক্ষ আছে, তাহা জঙ্গলে অযত্নে বৃদ্ধি পায়, ইহা ঔষধ ও অন্যপ্রকারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

বনজ অনেক পদার্থ আছে—যাহার ব্যবহার বা উপকারিতা আমরা অবগত নহি।

বৈদ্যরাজ নামক যে এক প্রকার গাছ আছে তাহা নাম ভেদে সর্ব্বত্র পরিচিত, কোথাও ইহা পীতরাজ, রয়না, রণা প্রভৃতি নামে প্রদেশ-বিশেষে পরিচিত হইয়া থাকে। ইহা গ্রামের সাধারণ জঙ্গলে জন্মিয়া থাকে, ইহা কেবল ক্ষুদ্র বৃক্ষ নহে, ইহার বড় গাছগুলি দ্বারা গৃহের সরঞ্জাম, চৌকী, আলমারী, চেয়ার টেবল ইত্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে, ইহার ছোট ছোট গাছ ও ডালপালা জ্বালানী কাষ্ঠ রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইহার একপ্রকার বীজ হয়, সেই বীজ দ্বারা তৈল প্রস্তুত হয়, এই তৈল কেরোসিনের আগমনের পূর্ব্বে এ দেশে জ্বালানীরূপে ব্যবহার হইত। এই তৈল কোন ঔষধ বা ঔষধরূপে ব্যবহারের কথা জানিনা। এই তৈল বেশ ঘন ও পরিষ্কার, আস্তে আস্তে জ্বলে, ইহার আস্বাদ তিক্ত, এখন আর কোন গৃহস্থ ইহার বীজ সংগ্রহ করে না, বীজগুলি জমিতে পড়িয়া থাকে ও গাছের নীচে প্রচুর চারা জন্মে।

ইহা ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় সে কথা না জানিলেও ইহা জন্তু বিশেষের রোগ বিশেষে ব্যবহারের ফল দেখিয়াছি। একবার আমার একটী হাতীর পীঠে প্রকাণ্ড ঘা হয়, চিকিৎসক আনাইয়া নিযুক্ত করি। কিন্তু আমার কেমন এক খেয়াল হইল জানিনা, এই বীজের তৈল প্রস্তুত করিলাম, শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর স্বর্গীয় বিরজাচরণ গুপ্ত কবিরাজ মহাশয় আমাকে "বনৌষধি দর্পণ" উপহার দিয়া ছিলেন, আমি তাহা দেখিয়া ইহার রোগ আরোগ্যের ক্ষমতার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রাপ্ত হই। বীজগুলি দিয়া তৈল প্রস্তুত হইলে সর্ব্বাগ্রে আমি জ্বালানি কার্য্যে ব্যবহার করি, পরে এই তৈল ও তৎসহ বিষকচু এবং আর একটী বনজ পদার্থ তাহাতে মিশাইয়া ঘায়ে ন্যাকড়া দ্বারা ভরিয়া দিতে থাকি, কয়েক দিন পর ঘা লাল হইয়া ভরিয়া শুকাইতে লাগিল, অবশেষে এই ঔষধেই হাতী আরোগ্য লাভ করিল। আমার বিশ্বাস, ঠিক এই তৈল অথবা ইহার অন্তর্বিধ সহকারী ঔষধেই হাতীটির রোগ আরোগ্য হইয়াছে। আমার একটী গাভীর শরীরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘা হয়, বোধহয় তাহাই সংক্রামিত হইয়া ঘোড়াতেও আসে, আমি কেবল এই তৈল গরু ও ঘোড়াকে ব্যবহার করিতে দিয়া ফল পাইয়াছিলাম। তাহারা এই ঔষধে রোগমুক্ত হইল। উহাদের সকল স্থল ফুলিয়াছিল, তাহাতেও এই তৈল মালিস করিয়া দিতে লাগিলাম, অবশেষে ফুলা স্থানগুলিও আরোগ্য হইলে বুঝিলাম এই তৈলেরই এইরূপ আরোগ্য করিবার ক্ষমতা আছে।

আমিত এইরূপ ফল পাইয়াছি। মানুষের রোগে পরীক্ষা করিবার সাহস পাই নাই। আমার অভিজ্ঞতার সামান্য কথা বিবৃত করিলাম, আশা করি চিকিৎসকগণ ইহাকে ঔষধ রূপে ব্যবহার করিয়া দেখিবেন। সর্ব্বত্র প্রচুর পাওয়া যায় বলিয়া ইহাকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। আর যদি কেহ ইহা ঔষধরূপে ব্যবহার করিতে না চাহেন, তাহা হইলেও জ্বালানী তৈলরূপে যদি ব্যবহার করেন, তবে নবাগত কেরোসিনকে নির্ব্বাসন দণ্ড দিতে পারা যায়। তাহা হইলেও দেশের একটা কাজ হইল মনে করিতে পারিবেন।

পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ ও টোট্‌কা।†

(কবিরাজ শ্রীহরিচরণ গুপ্ত)

কাটাকাটি বা ছেঁচিয়া রক্ত বাহির হইলে।—

শরীরের কোন স্থান কাটিয়া বা ছেঁচিয়া রক্ত বাহির হইলে তৎক্ষণাৎ কুক্‌সিমা পাতার রস সেইস্থানে দিলে রক্ত বন্ধ হইবে ও বেদনা ক্রমে ক্রমে নরম পড়িয়া যাইবে।

বৃশ্চিক দংশনে।—বৃশ্চিক দষ্টস্থানে মাছের ঝোল দিয়া ২।৪ বার ধুইয়া ফেলিলে জ্বালা-যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

সর্দ্দিতে।—

বুড়ি পান ও কাঁচাসুপারির রস ২।৪।বার মস্তকে দিলে এবং খুদ্‌-কেশুরিয়ার রস কর্ণের মধ্যে দিলে সর্দ্দি নিবারিত হয়।

মূত্রকৃচ্ছে।—(ক)

খুদেনোনা, মাখন ও সোরা সমপরিমাণে একত্র করিয়া তলপেটের নিম্নভাগে প্রলেপ দিলে যে কোন প্রকারের বদ্ধপ্রস্রাব সরল হইবে।

(খ) তাজা চুণ, পচা আমপাতা এবং সোরা সমপরিমাণে লইয়া মর্দ্দন করিয়া নাভি স্থলে প্রলেপ দিলে সরল প্রস্রাব হয়। কলেরা রোগের প্রস্রাব করাইবার জন্য ইহা অব্যর্থ ঔষধ।

স্মৃতিশক্তি বর্দ্ধনে।—হরিদ্রা, বচ, কুড় (শোধিত) পিঁপুল, শুঁঠ, জীরা, যমানী, যষ্টি-মধু, ও সৈন্ধব প্রত্যেকের সম পরিমাণ চূর্ণ লইয়া (১০ রতি) ঘৃতের সহিত ২১ দিন সেবন করিলে স্মৃতি শক্তি বর্দ্ধিত হয়।

পোড়া ঘা এবং অন্যান্য ক্ষতে।—সর্ষপ তৈল ⁄।০, কেলেকড়ার মূলের ছাল ২ তোলা। অনন্তমূল ১ তোলা, অপামার্গমূল ১ তোলা। প্রথমে সর্ষপতৈল একটী পিত্তলের বাটীতে জ্বাল দিয়া ফেনা রহিত হইলে, ঐ দ্রব্যগুলি ছেঁচিয়া তৈলে নিক্ষেপ করিবে এবং ভালরূপ ভর্জ্জিত হইলে নামাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া ছাঁকিয়া লইবে; ইহাতে পোড়া ঘা, বিষাক্ত ঘা ও দুষ্টব্রণ আদি শান্তি হয়।

নাসারোগে।—খাঁটি সরিসার তৈল ও কাঁচা দুর্ব্বার রস—সম পরিমাণ লইয়া ক্রমে ২।৩ দিবস নাকে টানিলে যন্ত্রণাদায়ক পুরাতন নাসা রোগের আশুফল হয়।

অম্লপিত্তে।—(ক) ত্রিফলা, পটোলপত্র (পল্‌তা) কট্‌কী সমান ভাগে লইয়া কাথ করিয়া সম পরিমাণ ইক্ষুচিনি দিয়া খাইলে পুরাতন অম্লপিত্ত আশু বিনষ্ট হয়। কাথ করিবার নিয়ম —প্রত্যেক দ্রব্য ৷৵০, জল ⁄৷০ সের শেষ ৵০ পোয়া।

(খ) বাসক, গুলঞ্চ ও কণ্টিকারির কাথে মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে অম্লপিত্ত নষ্ট হয়।

বায়ুবিকারে।—কেলেজীরা ।০ তোলা,

† এই পরীক্ষিত মুষ্টি যোগাদি বজরাপুর নিবাসী বিখ্যাত কবিরাজ স্বর্গীয় নক্ষত্রচন্দ্র গুপ্ত কবিরত্নের স্বহস্ত লিখিত জীর্ণ পঁথি হইতে সংগ্রহ করিয়াছি।—লেখক।

নিসিন্দার কচিপাতা ৴৹ আনা ও পিপুলের মূল ।৹, জল ⁄॥৹ সের, শেষ আধপোয়া এই কাথ প্রত্যহ দু'বেলা পান করিলে বায়ুরোগ নষ্ট হয়।

ফোঁড়া বসানয়—মহা সমুদ্রের পাতা ২টা, গোলমরিচ ২টা, কটুহুঁকার জলে বাটিয়া ফোঁড়ার উপর লাগাইলে ফোড়া বসিয়া যাইবে।

গোদে—শোধিত মিঠাবিষ, হড়হড়ের মূল ও ছাল, হরীতকী, অনন্ত মূল ও তেঁতুলের বীজের শাঁস ও শিরিষ ছাল—সমান ভাগে লইয়া সিজের পাতার রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ লাগাইলে বহুদিনের গোদ রোগ ভাল হয়।

গণ্ডমালায়—কনকধুতুরার মূলের ছাল, এরণ্ডমূল, নিসিন্দার পাতা, শ্বেত পুনর্ণবা ও সজিনার মূলের ছাল—সমভাগে লইয়া সরিষার তৈলের সহিত মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিলে গণ্ডমালা ভাল হয়।

বহুমূত্রে।—গেঁটেদুর্ব্বা ।৹ আনা, চেঁচোর মূল, যজ্ঞডুম্বুর, আমলা, হরীতকী, ধনে ও গন্ধ মুথা, সমান ভাগে লইয়া কাথ প্রস্তুত করিয়া ইক্ষুচিনি প্রক্ষেপ দিয়া ৭ দিন দুবেলা খাইলে সকল প্রকারের বহুমূত্রের যন্ত্রণা ও মুহুর্মুহু প্রস্রাব নির্গত, নিশ্চয়ই আশু উপশমিত হইয়া থাকে। পাঠকগণের নিকট নিবেদন, এই মুষ্টিযোগটী তাঁহারা যেন অবশ্য অবশ্য পরীক্ষা করেন।

সান্নিপাত জ্বরে নস্য—সৈন্ধব ১ ভাগ, সজিনা বীজ ১ ভাগ, সরিষা ১ ভাগ, কুড় ১ ভাগ—ছাগী মূত্রের সহিত মাড়িয়া ঐ রসের নাস করিতে হইবে—এইটী বিশেষ পরীক্ষিত।

শরীরের যে কোন স্থান অগ্নিতে দগ্ধ হইলে তৎক্ষণাৎ ঘৃতকুমারীর শাঁস ও রস সেই স্থলে দিলে সঙ্গে সঙ্গে জ্বালা যন্ত্রণা নিবারিত হয় ও ফোস্কা হয় না।

ঘোর সন্নিপাতে অঞ্জন—তেলাপোকার নাদি ৴৹ আনা পরিমাণ লইয়া মধুর সহিত ঘসিয়া চক্ষে অঞ্জন দিলে সান্নিপাতে চক্ষু দূষিত হইলে চক্ষু ভাল হয় এবং ব্যারামও ক্রমশঃ কমিতে থাকে।

ক্রিমি রোগে:—দাড়িম ছালের কাথ ⁄৹ একছটাক ও তিল তৈল ৴৹ আনা (ওজন) মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ প্রাতে খালি পেটে পান করিলে কোষ্টস্থ সমস্ত ক্রিমি নিঃসৃত হইয়া যায়।

তমক শ্বাস কাসে পার্শ্ব বেদনায় প্রলেপ—রাস্না ॥৹ তোলা, হরিদ্রা ⁄৹ আনা, দারুহরিদ্রা ⁄৹ আনা, শুলফা ⁄৹ আনা, দেবদারু ⁄৹ আনা, জীবন্তী ৴৹ আনা, ও মিছরি ৴৹ আনা একত্র জলে মর্দ্দন করিতে হইবে, পরে পুরাতন ঘৃত ও তিল তৈল ২ তোলা পরিমাণ মিশাইয়া ঈষৎ গরম করিয়া বেদনাস্থলে পুরুভাবে প্রলেপ দিয়া কলার মাজপাতা বাঁধিয়া রাখিতে হইবে, এইরূপে ৩।৪ দিন ব্যবহার করিলে পার্শ্ববেদনার বিশেষ শান্তি হইবে।

মুথা, ক্ষেত্রপর্পটী, কেশুর ও চন্দন সমভাগে গ্রহণ করিয়া জল দিয়া ১ প্রহর কাল ভিজাইয়া রাখিয়া পরে ঐ জল পান করিলে তৃষ্ণা রোগ নিবারিত হয়।

মৃগী রোগে নাসিকা হইতে পোকা বাহির করিবার ব্যবস্থা:—

লাল বর্ণের পদ্মের মূল ও হিঙ্গুল সমভাগে লইয়া জলে মর্দ্দন করিয়া চারি অঙ্গুলী প্রমাণ

বাতি প্রস্তুত করিতে হইবে, পরে ঐ বাতিতে টাট্‌কা গব্য ঘৃত মাখাইয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া ২ নাকে ২টী বাতি আস্তে আস্তে প্রবেশ করাইয়া দিলে ঐ বর্ত্তিকার আকর্ষণে নাসারন্ধ্র হইতে পোকা বাহির হইয়া ঐ বাতিতে কামড়াইয়া ধরিলে ঐ বাতি টানিয়া বাহির করিয়া ফেলিতে হইবে। এইরূপ করিলে মৃগীরোগ শান্তি হয়।

মন্যাস্তম্ভে প্রলেপ :—

কাল মুরগীর ডিমের কুসুম, জরদা, বেলে সিন্দুর, ও গব্যঘৃত সম পরিমাণে একত্র মিশ্রিত করিয়া একখানি নেকড়ায় মাখাইয়া ঘাড়ে বাঁধিয়া দিতে হইবে—৩।৪ দিন ব্যবহার করিলে প্রত্যক্ষ ফল দেখা যায়।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়।

[কবিরাজ শ্রীযামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম, এ, এম, বি]

:o:

প্রতিষ্ঠার কথা।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের শ্রীসাধনকল্পে গত আট বৎসর পূর্ব্বে কয়েকজন প্রথিত নামা কবিরাজের চেষ্টায় এই অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল—তাহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন।

উদ্দেশ্য।

হিন্দু রাজত্বের পরে, এই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের বিশেষ কোনও উন্নতি হয় নাই। মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের সময়ও প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ বড় বড় উদ্যান-বাটিকায় নানাবিধ ভেষজগুল্ম লতাদি উৎপন্ন করাইয়া সর্ব্বদা পরীক্ষা করিতেন। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে কতক সংখ্যক ব্যক্তিকে রাজা বিশিষ্ট চিকিৎসকদিগকে দান করিতেন। তাঁহারা উহাদের উপর বিষ প্রয়োগ এবং অঙ্গচ্ছেদ প্রভৃতি দ্বারা বৈজ্ঞানিক ভাবে চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতির ব্যবস্থা করিতেন। এ প্রথা হয় ত নিষ্ঠুর ছিল, কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের যে নানা দিক দিয়া উন্নতি সাধিত হইতেছিল, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ মাত্র নাই। যে বিদ্যা উন্নতিশালিনী, তাহা কখনও বাহিরের বিরুদ্ধে অর্গল বদ্ধ করিয়া রাখে না। মহানদী, মহাসমুদ্র, পৃথিবীর যাবতীয় আবর্জ্জনা বহন করিয়াও আত্মবলে পুষ্ট হইয়া থাকে ; কিন্তু কূপোদক পাছে নষ্ট হয়, এই ভয়ে তাহাকে সর্ব্বদা বাহির হইতে রক্ষা করার প্রয়োজন হয়। আমাদের কবিরাজী শাস্ত্র এখন সেই কূপোদকে পরিণত হইয়াছে।

এদিকে প্রতীচ্য দেশ সমূহে, জীবন পণ করিয়া বিজ্ঞানবিদ্‌গণ নানা শাস্ত্রের আলোচনা করিতেছেন। আমরা আমাদের চিকিৎসা

শাস্ত্রকে, তাঁহাদিগের নিকট হইতেও বাঁচাইয়া চলিতেছি। অধুনা শল্যবিদ্যা ও শারীর বিদ্যায় তাঁহারা প্রভূতরূপে অগ্রসর হইয়াছেন, হিন্দুরা এক সময়ে এই সকল বিদ্যার আবিষ্কার কর্ত্তা হইলেও এখন নিতান্ত পশ্চাদ্‌পদ হইয়া, নিম্নশ্রেণীর উপর ঐ বিদ্যার অতি সামান্য আলোচনার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, সুতরাং সুশ্রুতের নানারূপ সূক্ষ্ম অস্ত্র ও যন্ত্রাদির স্থলে এখন নরসুন্দরের নরুণই এক মাত্র আশ্রয় স্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ হিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, আমাদের শারীর ও অস্ত্রবিদ্যা যাহা এখন হতশ্রী হইয়া পড়িয়াছে, বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাহার উন্নতি সাধন একান্ত প্রয়োজন। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের উদ্যোক্তাগণ ডাক্তারদিগের বিরুদ্ধে বিদ্যালয়ের অর্গলবদ্ধ না করিয়া, তাঁহাদিগকেও আমাদের আয়ুর্ব্বেদের শ্রীসাধনের সাহায্যার্থ সমাদরে আহ্বান করিয়াছেন। আমাদের ছাত্রগণ এখন আর ক্ষত চিকিৎসার ভয়ে ডাক্তারকে ডাকিয়া নিজেরা সরিয়া পড়েন না। কবিরাজি ঔষধাদি বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষা করিয়া আমরা সাধ্যানুসারে নব আবিষ্কারের চেষ্টা করিতেছি। বিদ্যালয়ে শবচ্ছেদের ব্যবস্থারও আয়োজন চলিতেছে। এ পর্য্যন্ত বহু চিকিৎসক আমাদের বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে যশস্বী হইয়াছেন। এলোপ্যাথি প্রভৃতির যাহা কিছু গৌরব,—আমদের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র তাহা আয়ত্ত করিবে, অথচ আমাদের দেশীয় চিকিৎসার গৌরব ও বিশেষত্ব নষ্ট হইবে না—এই পণ করিয়া বিদ্যালয়ের হৈতৈষিগণ অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিতেছেন।

ইতিহাস।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, গত আট বৎসর পূর্ব্বে এই বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তখন ইহার ছাত্র সংখ্যা সামান্যই ছিল। অধ্যাপকও সেই হিসাবে অল্প সংখ্যকই ছিলেন। এই বিদ্যালয়ের উদ্যোক্তাগণ নানারূপ ভেষজ গুল্ম লতা ও জীব কঙ্কালাদি এতদর্থে সংগ্রহ করিয়া পাঠার্থী দিগের কর্ম্মক্ষেত্রের প্রসারণ করেন। অধুনা ছাত্র সংখ্যা যথেষ্ট বাড়িয়াছে, অধ্যাপকও ১৭।১৮ জন নিযুক্ত হইয়াছেন। এই কয় বৎসরের মধ্যে অনেকগুলি ছাত্র আমাদের বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের অধীনে আয়ুর্ব্বেদীয় উপায়ে চিকিৎসার জন্য দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন। কেহ কেহ স্বাধীন ভাবে ব্যবসায় করিয়া, মাসিক ৪।৫ শত টাকা উপার্জ্জন করিতেছেন। আমাদের ছাত্র যেরূপ বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে এই বিদ্যালয় যে বঙ্গদেশে আয়ুর্ব্বেদচর্চ্চার কেন্দ্র স্বরূপ হইবে, তৎসম্বন্ধে কাহারও অনুমাত্র সন্দেহ নাই। এই বিদ্যালয়ের গণ্ডী শুধু বঙ্গদেশে আবদ্ধ নহে। দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, লাহোর এমন কি স্বাধীন নেপাল ও সুদূরস্থিত সিংহল প্রভৃতি স্থান হইতেও বন্যার মত ছাত্র প্রবাহ এই বিদ্যালয়ে আসিতেছে। দিল্লী ও লাহোরের আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় সমূহের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তাহাদের শিক্ষা সমাধানের জন্য তদ্দেশীয় ছাত্রগণ এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছেন। আমাদের এই বিদ্যালয়ে—বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ এবং এম, এ, পাস করিয়া বহু কৃতবিদ্য ছাত্র পড়িতেছেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের এই মিলন-মন্দিরে, আয়ু-

র্ব্বেদ বিদ্যা প্রভৃত শ্রীশালিনী হইয়া গৌরব লাভ করিয়াছেন। আশা করা যায়, অচিরে এই বিদ্যাচর্চ্চাসম্ভব বহুসংখ্যক ভারতীয় যুবকের কর্ম্মক্ষেত্রের ভিত্তি ও জীবিকা উপার্জ্জনের উপায় স্বরূপ হইবে।

প্রার্থনা।

এ পর্য্যন্ত এই বিদ্যালয় লইয়া খুব জোরে ঢেঁড়ি পিটান হয় নাই। কর্ম্মিগণ অনেকটা নিঃশব্দেই কাজ করিয়া আসিতেছিলেন, এখন আমাদের কাজ অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। সুতরাং সাধারণের নিকট আমাদের উপস্থিত হইবারও সময় হইয়াছে। আমাদের দেশে কোনও সুবোধ উদ্যম হইলে, সাহায্য করিবার লোকের অভাব হয় না। কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, আমাদিগকে বাৎসরিক সাড়ে তিন হাজার টাকা দিয়া আসিতেছেন। সম্ভবতঃ এই দানের পরিমাণ তাঁহারা বাড়াইয়া দিবেন। কলিকাতার উপকণ্ঠে বিস্তৃত শ্যামবাজার পার্কের সম্মুখে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি আমাদিগকে গৃহ নির্ম্মাণের জন্য এক বিঘা এগারো কাঠা জমি দান করিয়াছেন, কয়েক দিবসের মধ্যেই আমাদের হিতৈষিগণ দুইলক্ষ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। কিন্তু আরও অনেক চাই, শুধু অধ্যয়ন ও ছাত্র নিবাসের জন্য নহে, আমরা বিস্তৃত ভাবে যে হাসপাতাল স্থাপন করার পরিকল্পনা করিয়াছি ও শারীর বিদ্যা চর্চ্চার জন্য কর্ম্মশালার আয়োজন করিতেছি তাহাতে প্রভূত পরিমাণ অর্থ সাহায্যের দরকার। মার্টিন কোম্পানি এতদর্থে প্রায় তিন লক্ষ টাকার এষ্টিমেট দিয়াছেন, এ শুধু বিদ্যালয়ের জন্য। হাসপাতালাদির জন্য আরও ৫।৬ লক্ষ টাকার দরকার। আমরা ভিক্ষার ঝুলি লইয়া এতদর্থে সাধারণের নিকট উপস্থিত হইতেছি। আমাদের কর্ম্মে বিশ্বাস আছে ও সাধারণের অনুকম্পায়ও আস্থা আছে। আমরা নিশ্চয় বিশ্বাস করি, আমাদের নিঃস্বার্থ পরিশ্রম, এই কর্ম্মক্ষেত্রকে ক্রমোন্নতির পথে লইয়া যাইবে এবং ইহার শুভ পরিণাম অব্যাহত থাকিবে। বিন্দু বিন্দু লইয়াই সমুদ্র। আমরা ক্ষুদ্রকে উপেক্ষা করিব না। আমরা যেরূপ রাজা মহারাজা ও অপরাপর বড়লোকদিগের দ্বারস্থ, সেইরূপ সামান্য গৃহস্থের নিকটও সাহায্যপ্রার্থী। আশা করি, এই মহৎ অনুষ্ঠানে যিনি যাহা পারেন, তিনি সাধ্যানুসারে তাহা দান করিয়া এই জাতীয় বিদ্যালয়ের ভিত্তি সুদৃঢ় করিবেন।

আমাদের কাণ্ডারী।

শ্রীযুক্ত অনরেবল স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, কে, টি, সি, এস, আই মহোদয় এই বিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাষ্টির এবং মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী এম, এ, এল, এম, এস মহাশয় কলেজ কাউন্সিলের সভাপতি। প্রত্যেক বাঙ্গালীর নিকট—প্রত্যেক ভারতবাসীর নিকট এই বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ সাহায্যপ্রার্থী। সশ্রদ্ধ ভাবে অতি সামান্য দানও আমরা কৃতার্থ হইয়া গ্রহণ করিব।

দুইটি বনৌষধি।

পর্পট—ক্ষেৎপাঁপড়া, হিং—পীৎপাঁপড়া

(কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন)

ক্ষেৎপাঁপড়া বর্ষা শেষে জন্মিয়া শরতকালে পুষ্ট হয় এবং গ্রীষ্মকালে মরিয়া যায়। ইহা কিঞ্চিৎ আদ্র ভূমিতে জন্মে। মূল হইতে উৎপন্ন হইয়া ইহার লতাগুলি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, জমির সহিত লতাগুলি সংলগ্ন থাকে, পত্রগুলির আকৃতি, তেঁতুলের পত্রের ন্যায় তেতুল পত্র হইতে কিঞ্চিৎ লম্বা ও কোমল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বেত বর্ণের পুষ্প হইয়া থাকে।

ক্ষেৎপাঁপড়া—পুরাতন জরের একটা মহৌষধ। বৈদ্যক শাস্ত্রে ইহা নানা প্রকারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পাচন, স্বরস ঘুষুড়া ও ঔষধের সহপানে প্রয়োজ্য।

ম্যালেরিয়া জ্বরে ক্ষেৎপাঁপড়া—ক্ষেৎপাঁপড়া, গুলঞ্চ, কট্‌কী ও হরীতকী সমভাগে ২ তোলা পরিমাণে লইয়া অর্দ্ধসের জলে জাল দিবে, অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ঐ ক্বাথ প্রত্যহ প্রাতে পান করিলে ম্যালেরিয়া জর নিবৃত্ত হইয়া থাকে।

গুলঞ্চ, ক্ষেৎপাঁপড়া, আদা, পান, সেফালিকা পত্র—প্রত্যেক সম পরিমাণে গ্রহণ করিয়া শিলায় কুট্টিত করিবে, একখান কলা পাতায় উহা মোড়ক করিয়া কাঠকয়লার অগ্নির উত্তাপে সেঁকিয়া লইবে, ঐ পাতড়া খানি রাত্রিতে অনাবৃত স্থানে বাহিরে রাখিয়া দিবে, পর দিবস প্রত্যূষে ঐ কুট্টিত দ্রব্যগুলি পেষণ করিয়া উহার রস বহির্গত করতঃ ঐ রস সহপানে অবস্থা দৃষ্টে "চন্দনাদি লৌহ", পুট পাক বিষম জরান্তকলৌহ প্রভৃতি পুরাতন জরের ঔষধ প্রয়োগ করিলে দীর্ঘকালোৎপন্ন পুরাতন জরের উপশম হইয়া থাকে। ইহাকে "ঘুষুড়া" সহপান বলে।

রক্তপিত্তে—ক্ষেৎপাঁপড়া

ক্ষেৎপাঁপড়ার ক্বাথ, স্বরস, কল্ক শীত কষায় রক্তপিত্ত রোগে বিশেষ উপকারী।

পিত্ত প্রধান জরে ক্ষেৎপাঁপড়াঃ—পৈত্তিক জরে একমাত্র ক্ষেৎপাঁপড়ার ক্বাথ জরনাশক।

বমন রোগে ক্ষেৎপাঁপড়া—জরে বমন হইলে ক্ষেৎপাঁপড়ার ক্বাথ মধু সহযোগে পান করিলে বমন নিবৃত্তি হয়।

আকনাদি, হিং পাড়,

অতিসারে আকনাদি

গোদুগ্ধ জাত দধির সহিত আকনাদির মূল পেষণ করিয়া প্রাতে সেবন করিলে অতিসার নিবৃত্ত হয়। আকনাদি মূলের পরিমাণ চারি আনা ওজনে গ্রহণ করিবে।

অর্শে আকনাদি—ঘোলের সহিত আকনাদির মূল পেষণ করিয়া সেবন করিলে বায়ুর অনুলোম হইয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া থাকে।

লবণ স্নেহে আকনাদি—যাহার লবণ স্নেহ হইয়াছে তাহার পক্ষে আকনাদির মূল ও অগুরুর ক্বাথ বিশেষ উপযোগী।

আকন্যাদি জ্বর রোগেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইহা মূত্রকারক, অতিসার নাশক, মূত্রাশয়ের প্রদাহ নিবারক।

অন্তর্বিদ্রধির অপক্ক অবস্থায় আকনাদির মূল মধুর সহিত পেষণ করিয়া আতপ চাউল ধৌত জলের সহিত সেবন করিলে অন্তর্বিদ্রধি পাকিয়া বিলীন প্রাপ্ত হয়।

সুখ প্রসবে আকনাদি— গর্ভস্থ সন্তানের মস্তক যোনিমুখে আগত হইয়াও যদি অবিলম্বে প্রসব না হয়, তাহা হইলে আকনাদির মূল পেষণ করিয়া যোনিতে প্রলেপ দিলে অনতিবিলম্বে সন্তান ভূমিষ্ট হইবে।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বৃদ্ধের বচন।

[শ্রীক্ষীরোদলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন, বি-এ]

—:o:—

একদিকে গো রোগের জ্বালায়,
জর্জ্জরিত গরীব দেশ ;
অন্যদিকে ধর্ম্মনীতি,
শুচিসংযম নাহি লেশ।
এই ত মোদের অকাল বিয়োগ—
প্রবল কারণ দেখ্ছি ভাই,—
কুনীতি করে মনটা নরক,
পচায় দেহ ভস্ম ছাই।
মাথার খাটুনি বেড়ে গেছে
পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক গুণ,—
বাল্যেহ'তে কদভ্যাসে
কাঁচা বাঁশে লাগে ঘুণ।
দেশে যে নাই ভাল খাবার,
ঘৃত, দুগ্ধ, মৎস্য, ফল—
কি ক'রে হবে দীর্ঘ জীবন ?
কি ক'রে হ'বে বীর্য্যবল ?
পুঁজি মূলধন জমার খবর
রাখ্লিনা রে মূঢ় দীন!

তাইত তোরা স্বাস্থ্য শক্তি—
তেজস্কান্তি মেধাহীন।
আয় বুঝে না ক'র্লে রে ব্যয়
ক'দিন পুঁজি থা'ক্বে তোর,
বেহুঁস হ'য়ে খরচ করিস,
ঠিক যেন রে নেশাখোর!
শক্তি বলের অপচয়টি
সইতে নারেন ভগবান্ ;
তাইত তোদের অকাল মরণ,—
এ যে তাঁরই শাস্তিদান।
এম্নি খাওয়া পরার উপর
অতিরিক্ত শ্বাসের ব্যয় ;—
অজপা যে ফুরিয়ে এল,
জীবন-কোষটা কিসে রয় ?
ঘোড়ার মুখেও দানা দেবে,
তবেই তো সে ছুটবে ভাই,
দেহবাজীর তোয়াজ বিনা
দেহের সুখটা কিসে চাই ?

ছেকড়া গাড়ীর ঘোড়াও যারা
তারাও বিরাম খানিক লয়,
তোমার যে ভাই নাহিক বিরাম
কিসে তোমার দেহ রয় ?

মাথার খাটুনি কমিয়ে দিয়ে
দেহের দিকে নজর দাও,
জ্ঞানের মূলে প্রেমের বারি
ঢালো,—যদি স্বাস্থ্য চাও।

বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ।

হৃদযন্ত্রের কার্য্য।

মানুষ যদি তাহার হৃদযন্ত্রের কার্য্য সম্বন্ধে ভাল করিয়া জানিত ও বুঝিত তাহা হইলে মানুষের জীবন দীর্ঘ হইত। প্রত্যেক মানুষের নিজের হস্তের মুষ্টি অপেক্ষা হৃদযন্ত্রের আকার বড় নহে। ফুসফুসের পার্শ্বে বুকের সম্মুখ ভাগে দুইটি থলিয়ার মধ্যে হৃদযন্ত্র অবস্থিত।

হৃদযন্ত্রের প্রায় সমস্ত অংশই আঁশযুক্ত পেশী দ্বারা প্রস্তুত। কিন্তু ইহা দুই ভাগে বিভক্ত, মধ্যে গহ্বর আছে। অন্যান্য পেশীর ন্যায় ইহাও সঙ্কুচিত হয় কিন্তু এই পেশীর মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যাহার জন্য ইহার নানা অংশ নির্দ্দিষ্ট সময়ে এবং ঠিক পরে পরে উহাদিগের সঙ্কোচন হয়। দেখা গিয়াছে যে যদি কোন জীবন্ত প্রাণীর হৃদযন্ত্র তাহার শরীর হইতে বাহির করিয়া লওয়া হয়, তবে কিয়ৎক্ষণের জন্য ঐ হৃদযন্ত্র শরীরের অভ্যন্তরে যেমন চলিতেছিল তেমনি চলিতে থাকে।

এই নিয়মিত সঙ্কোচনের ফলে হৃদযন্ত্র হইতে চাপ প্রাপ্ত হইয়া দুই দিকে রক্ত প্রবাহিত হয়। একদিকের রক্ত বড় ধমনী সকলের দিকে যায়। তথায় ইহা বাধা প্রাপ্ত হয় এবং অপরদিকের রক্ত হৃদযন্ত্রের অপর ভাগে যায়। তথায় অল্পই বাধা পায়। তথা হইতে রক্ত সমস্ত শরীরে প্রবাহিত হয় এবং এইরূপে শরীরকে খাদ্য প্রদান ও পুষ্ট করে।

যে সকল স্থিতিস্থাপক নল দিয়া রক্ত গমনাগমন করে তাহাদিগকে ক্ষুদ্র ধমনী ও শিরা বলে। উহার রক্তে পূর্ণ থাকায় হৃদযন্ত্র যখন নূতন রক্ত তথায় প্রবাহিত করে তখন উহা তথায় প্রবাহিত করিবার জন্য হৃদযন্ত্রকে জোরে চাপ দিতে হয়। এই রক্ত হৃদযন্ত্র কর্ত্তৃক একবার চাপ পাইয়া বাধা পাইলে পুনরায় ফিরিয়া আসিতে পারে না। কারণ ধমনীতে রক্ত ফিরিয়া যাহাতে আসিতে না পারে সেজন্য বাধা দিবার যন্ত্র আছে। হাতের কব্জীর নাড়ীতে হাত দিলেই হৃদযন্ত্র কিরূপভাবে কার্য্য করিতেছে তাহা বুঝিতে পারা যায়। এইস্থানে যে নাড়ী অনুভূত হয় তাহা হৃদযন্ত্রের চাপের দ্বারা প্রবাহিত রক্তের জন্য। হৃদযন্ত্র হইতে চাপ প্রাপ্ত রক্ত বহির্গত হইয়া ধমনী দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তের নলে যায় এবং তাহা হইতে শিরা বাহিয়া পুনরায় হৃদযন্ত্রে পৌছে। আমরা হৃদযন্ত্রের চলা এবং নাড়ীর গতি বুঝিতে পারি,

এমন কি শুনিতেও পাই। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে ঘোড়ার মত প্রাণীর শরীরে হৃদযন্ত্র হইতে রক্ত প্রবাহিত হইয়া সমস্ত শরীরের মধ্য দিয়া যাইয়া পুনরায় হৃদযন্ত্রে প্রবেশ করিতে অর্দ্ধমিনিট সময় লাগে।

হৃদযন্ত্র কিরূপ আশ্চর্য্যজনক কার্য্য করে তাহার সম্বন্ধে কয়েকটি বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল। প্রত্যেক মানুষের বুকের অভ্যন্তরে গড় পড়তায় এই যন্ত্র মিনিটে ৭৫ বার চলে অর্থাৎ ঘণ্টায় ৪৫০০ বার চলে। হিসাব করিলেই দেখা যাইবে যে দৈনিক ১০৮০০০ বার কিম্বা বৎসরে ৩৯০০০০০০ বার চলে এবং যদি মানুষ ৭০ বৎসর বাঁচে তবে ২০৭০০০০০০০০০ বার হৃদস্পন্দন হয়। পৃথিবীর মানুষের সমষ্টি ১,৭০০০০০০০০ হইলে সমস্ত মানবগণের হৃদযন্ত্র প্রতি মিনিটে ১২৭০০০,০০০,০০০ বার চলে অর্থাৎ এই বৃহৎ মানবজাতির হৃদযন্ত্র সকল প্রতি সেকেণ্ডে ২০০০০০০০০০০ বার চলে।

আমাদিগের হৃদযন্ত্র চারটি বিভাগে বিভক্ত। ইহার দুইটিতে রক্ত জমে, তাহা হইতে রক্ত বাহির হইয়া অপর দুই বিভাগে আসে, তথা হইতে চাপ পাইয়া রক্ত প্রবাহিত হয়। যখন এই দুইটি বিভাগ সঙ্কুচিত হয় তখন ইহার প্রথম বিভাগের অপরিস্কৃত রক্ত চাপদ্বারা ফুসফুসে প্রবাহিত করে, তথায় অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসিয়া রক্ত পরিস্কৃত হয় এবং অপর বিভাগ এই পরিস্কৃত রক্ত সমগ্র শরীরে প্রবাহিত করে। যখন হৃদযন্ত্র চলে তখন দশ ঘন ইঞ্চি পরিমাণ রক্ত হৃদযন্ত্র কর্ত্তৃক চাপ প্রাপ্ত হইয়া তীরবেগে বহির্ভূত হয়।

এই হিসাবে এক মিনিটে ৭৫ বার হৃদযন্ত্র চলিলে ৭৫০ ঘন ইঞ্চি পরিমাণ রক্ত প্রবাহিত করে। অর্থাৎ প্রতিঘণ্টায় ৪৫০০০ ঘন ইঞ্চি প্রতিদিন ১,০০০,০০০ ঘন ইঞ্চি ও বৎসরে ২২৫০০০ ঘন ফুট পরিমাণ রক্ত প্রবাহিত হয়। হৃদযন্ত্র যদি জল তুলিবার জন্য পম্প হইত তাহা হইলে এক বৎসরে ১৯৬০০০ মণ জল উপরে তুলিত। মাত্র মুষ্টির মত বড় একটি ক্ষুদ্র পেশীর দ্বারা এতটা কার্য্য হয় ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। বৎসরে যতটা রক্ত হৃদযন্ত্র কর্ত্তৃক পাম্প করা হয়, তাহা যদি একটা জলাধারে রাখা যাইত তবে তাহা ৬১ ফুট লম্বা ৬১ ফুট চওড়া এবং ৬১ ফুট উচু হইত অথবা বৃত্তাকার কোন জলাধারে রক্ত রাখিবার ইচ্ছা করিলে ৫০ ফিট ব্যাস, ১১৫ ফিট উচ্চ জলাধারের প্রয়োজন হইত এবং তাহাতে ১,৭০০,০০০ গ্যালন জল ধরিত। (প্রতি গ্যালন প্রায় তিন সের দশ ছটাক) পৃথিবীর সমস্ত মানুষের হৃদযন্ত্র একত্র করিলে ৪৮১ ফুট উঁচু হয়,—ইজিপ্টের পিরামিডও এত উঁচু। সকল মানবের হৃদযন্ত্র একবৎসর একত্রে যে কার্য্য করে তাহাতে ৭২'৯৫০ ফুট উচ্চ, ৭২৮৪০ ফুট লম্বা ও ৭২,৮৪০ ফুট চওড়া এক বৃহৎ পুষ্করিণী জলে পূর্ণ করা যায়। হিমালয়ের গৌরীশৃঙ্গ ২৯০০০ ফুট উচ্চ, সেই হিসাবে ঐ পুষ্করিণী গৌরী শৃঙ্গের আড়াই গুণ বেশী উচ্চ হইবে। সঞ্জীবনী।

বঙ্গে লোকক্ষয়।

(১৩২১ সালের আদমসুমারী অনুসারে)

জেলার নাম	জেলার পরিমাপ বর্গমাইল হিসাবে	প্রতি বর্গ-মাইলে লোকের বসতি	প্রতি জেলায় গ্রামের সংখ্যা	প্রতি শত স্ত্রীলোকের জন্মে পুরুষের জন্মের হার	প্রতি শত স্ত্রীলোকের মৃত্যুতে পুরুষের মৃত্যুর সংখ্যা	প্রতি সহস্র লোকের মধ্যে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর হারের আধিক্য
বর্দ্ধমান	২৭০৩	৫২২ জন	২৮১৭	১০৭	১০৯	৭'১
বীরভূম	১৭৫৩	৪৮৩ ,,	২৩০২	১০৬	১১১	৫'০
বাঁকুড়া	২৬২৫	৩৮৮ ,,	৪০০৩	১০৬	১০৬	৬'৮
মেদিনীপুর	৫০৫৫	৫২৮ ,,	১০৩৫১	১০৫	১০৩	৪'৪
হুগলী	১১৮৮	৯০৯ ,,	২১৯৭	১০৯	১০৭	৬'০৯
হাবড়া	৫৩০	১৮৮২ ,,	৮৬৩	১১১	১১২	২'২
২৪ পরগণা	৪৮৫৬	৫৪১ ,,	৩৪২৭	১১০	১১৭	৭'৩
কলিকাতা	২১	৪৩২৩১ ,,	১	১১৬	১০৭	১৪'৪
নদীয়া	২৭৭৮	৫৩৫ ,,	২৩১৩	১০৬	৫০৯	১০'৫
মুর্শিদাবাদ	২১২১	৫৯৫ ,,	১৯৭৪	১০৬	১১০	×
যশোহর	২৯০৪	৫৮৩ ,,	৩৬১৩	১০৫	১০৮	১১'৭
খুলনা	৪৭৩০	৩০৭ ,,	২০১১	১০৭	১১১	×
রাজসাহী	২৬২০	৫৬৯ ,,	২৪৪৮৭	১০৫	১০৬	৯'২
দিনাজপুর	৩৯৪৬	৪৩২ ,,	৬৬১২	১০৬	১১১	×
জলপাইগুড়ি	২৯৩১	৩১৯ ,,	৭২২	১০৬	১১১	×
দার্জ্জিলিং	১১৬৪	২৪৩ ,,	৩০৪	১০১	১০৮	১৩'৫
রঙ্গপুর	৩৪৯৬	৭১৭ ,,	৪১০২	১০৪	১০৭	×
বগুড়া	১৩৪৯	৭৬০ ,,	২৭৮০	১০৯	১১০	৯'৭
পাবনা	৬৭৮	৮২৮ ,,	২৫৩৯	১০৫	১১৫	৬'৩
মালদহ	১৮৩৩	৫৩৮ ,,	২২৩৯	১০৪	১১৯	×
ঢাকা	২৭২৩	১১৪৮ ,,	৪৭৩৭	১০৮	১০৯	২'৮
ময়মনসিংহ	৬২৩৮	৭৭ ,,	৭৩৫৪	১০৮	১০৯	×
ফরিদপুর	২৩৭১	৯২৯ ,,	৩৩৬৩	১০৯	১০৬	৮'৪
বাখরগঞ্জ	৩৪৯০	৭৫২ ,,	২৯৯০	১০৮	১১৫	×
চট্টগ্রাম	২৪৯৭	৬৪৫ ,,	৮৭০	১১০	১০৩	×
নোয়াখালী	১৫১৫	৯৭২ ,,	১৭১৯	১১০	১০৫	×
ত্রিপুরা	২৫৬০	১০৭২ ,,	৪০১৮	১০৯	১১৩	×
সমগ্রবঙ্গ	৭১৭০৫	৬৪৮ ,,	৮৪৭২৪৮	১০৭	১১০	২'১

—"সঞ্জীবনী।"

আয়ুর্ব্বেদে হাতুড়িয়া।

(শ্রীরাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ)

অনেকেই দেখিয়া শুনিয়া কবিরাজ; তঁাহারাই হাতুড়িয়া নামে অভিহিত। আর এক শ্রেণীর কবিরাজ আছেন তাঁহাদিগকে "পাজতড়ার কবিরাজ" বলিয়া থাকে, ইঁহারা কবিরাজের কাছে থাকিয়া কেবল পুঁথির পাতা উল্টাইয়া থাকেন, ইঁহারা সংস্কৃত জানেন না, বাঙ্গালা বা অন্যান্য ভাষাও কিছু যে জানেন তাহাও মনে হয় না। ইঁহারা পাড়াগাঁয় গিয়া স্বীয় বাক্য বলে দু'পয়সা রোজগার করিয়া থান। আজকাল এইরূপ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক গ্রামে গ্রামে পাওয়া যায়। একটী হোমিওপ্যাথিক বাক্স ও একখানা পুঁথি হইলেই তাঁহারা ডাক্তার সাজেন, পল্লীগ্রামে এইরূপ চিকিৎসকের অভাব নাই। পূর্ব্বোল্লিখিত কবিরাজের স্থান তাঁহারা অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। 'চিকিৎসা একবারে না করিলে যে সকল রোগী বাঁচে, ইঁহাদের চিকিৎসায় সেই সকল রোগীই বাঁচে, কোন কোন স্থলে ব্যতিক্রমও যে না হয় এমন নহে। কোন কোন স্থলে এইরূপ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি চিকিৎসকেরা এইরূপ ভাবে সমাজ মধ্যে প্রতিভাশালী হইয়া উঠেন, এসম্বন্ধে একটী প্রাচীন গল্প মনে পড়িল :—

কোন কবিরাজের এক পুত্র। তাহাকে পিতা শাস্ত্র পড়াইয়া কবিরাজ করিতে পারিলেন না। অবশেষে মৃত্যুকালে তাহাকে কিছু কিছু ঔষধ বলিয়া যাইবেন ভরসায় কবিরাজ—পুত্রকে ডাকিলেন, কিন্তু তিনি "কালা দানা ও সোণামুখী" বলিতেই তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইয়া গেল—অন্য কিছু বলিতে পারিলেন না। পুত্র মনে করিলেন আমি মস্ত কবিরাজ হইয়াছি। বাবা এই ঔষধ বাটিয়া রোগীকে খাইতে দিতেন। আমাকেও তাহাই দিয়া গিয়াছেন।

কিছুদিন পরে আর কেহ তাহাকে ডাকে না। একদা একব্যক্তি তাহার গরু হারানর জন্য কবিরাজ পুত্রের নিকট উপায় করিতে আসিল। কবিরাজ মহাশয় কোন কোন স্থলে জ্যোতিষের কথা আলোচনা করিয়া গণিয়া অনেক কথা বলিতেন। কবিরাজ-পুত্র তাহাকে কালাদানা ও সোণামুখী খাইতে দিয়া কহিলেন "তোমার গরু পাইবে, তোমার বাড়ীর পূর্ব্ব দিকে গিয়াছে। সে বাড়ী যাইতে না যাইতে এই ঔষধ খাইয়া তাহার দাস্ত হইল, সে ঘটী লইয়া মলত্যাগে বসিয়াই দেখিতে পাইল তাহার গরু বেতাল ঝোপে রশি জড়াইয়া আটক রহিয়াছে। গরু পাইয়া গৃহস্থ মনে করিল কবিরাজ অপেক্ষা কবিরাজ পুত্র ভাল, কবিরাজ পুত্রের অপূর্ব্ব ক্ষমতা, ক্ষণ বিলম্বেই ইহা সেই গ্রামে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

ক্রমে এ সংবাদ রাজ বাড়ীতে পঁহুছিল, রাণীর স্বুবর্ণ হার সেই সময় হারাইয়াছে। কবিরাজ পুত্রের নিকট সংবাদ পঁহুছিলে তিনি তাহার ঐ অপূর্ব্ব ঔষধ খাইতে দিলেন, রাজা সেই ঔষধ খাইয়া পায়খানায় গেলেন, দৌড়িয়া যাইতে যাইতে ভৃত্যকে জল লইয়া আনিতে কহিলেন কিন্তু ভৃত্য জল আনিতে বিলম্ব করায়

তিনি তাহাকে পাদুকা দেখাইয়া ভয় দেখাইলেন। ভৃত্য মনে করিল "এইরে এইবার সেরেছে, আমি যে হার চুরী করিয়াছি তা বুঝি জান্তে পেরেছে।" ভৃত্য প্রণিপাত করিয়া কহিল, "হুজুর এ যাত্রা মাপ করুন, আমি এখনই হার আনিয়া দিতেছি।" কবিরাজ পুত্রের নাম চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। চারি দিকেই তা'র ডাক, তা'র ঔষধও সেই একমাত্র সম্বল কালাদানা ও সোনামুখী—জোলাপের ঔষধ।

এক দিন সংবাদ আসিল, যুদ্ধ প্রয়াসী হইয়া রাজার রাজ্য দখল করিতে এক প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতি আসিয়াছেন। সংবাদ পাইয়া রাজ্যময় হুলস্থুল পড়িয়া গেল। রাজার ঐ কবিরাজ পুত্রের কথা মনে হইল, তিনি তাহাকে ডাকিলেন। কবিরাজ পুত্র আসিয়া তাহার ঐ অব্যর্থ মহৌষধের ব্যবস্থা করিলেন। গাড়ীগাড়ী কালাদানা ও সোণামুখী আসিয়া হাজির হইল, ঢেকিতে কুটিয়া তাঁহার সৈন্য দিগকে খাওয়াইয়া দেওয়া হইল, প্রতিপক্ষকে বলিয়া দেওয়া হইল, আমাদের সৈন্যগণের প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ হইলেই যুদ্ধারম্ভ হইবে।

এদিকে এ পক্ষের অল্প সংখ্যক সৈন্য হইলেও তাহারা অতি প্রাতঃকাল হইতেই ক্রমে পায়খানায় যাইতে থাকিল, এবং দুইপ্রহর অতীত হইলেও তাহাদের এই কর্ম্ম চলিতে লাগিল, অপর পক্ষের বহুসংখ্যক সৈন্য হইলেও তাহারা ইহা দেখিয়া ভীত হইয়া পলায়ন করিল, ভাবিল না জানি ইহাদের কত সৈন্য। জোর কপালে থাকিলে এইরূপই হয়। লোকে বলে "ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান বহন করেন।

আর এক শ্রেণীর হাতুড়িয়া আছেন, তাঁহারা কবিরাজের নিকট থাকিয়া অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া চিকিৎসক হইতে চাহেন। রোগীর যেরূপ অবস্থায় যে ঔষধ কবিরাজ দেন বা যেরূপ অনুমান করিয়া ঔষধ দেন তাঁহারাও সেইরূপ করেন।

আর একটী গল্প মনে পড়িল :—

একদা কোন কবিরাজের কোন রাজ বাড়ীতে ডাক পড়িল, সঙ্গে তাঁহার ছাত্র। কবিরাজ মহাশয় রোগীর নাড়ী টিপিয়া বলিলেন "আপনি কুপথ্য করিয়াছেন।" রোগী বলিল "না কই?" কবিরাজ ঘরের চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন "আজ্ঞে আপনি কমলা খাইয়াছেন।" পরে রোগী বলিল, "হাঁ তাই।" রোগীর নিকট হইতে উঠিয়া আসিলে ছাত্র জিজ্ঞাসা করিল "কেমন করিয়া নাড়ী ধরিয়াই বুঝিলেন যে রোগী কমলা খাইয়াছে?" কবিরাজ বলিলেন "ইহা অনুমান চিকিৎসা, আমি রোগীর ঘরে কমলার বাকল দেখিয়াই এইরূপ অনুমান করিয়াছি।" ছাত্র মনে করিল "তবে আমি অনুমান চিকিৎসায় প্রাজ্ঞ হইয়াছি।" ইহার পর কবিরাজ সেই রোগী দেখিতে একদিন ছাত্রকে পাঠাইলেন। সেই দিন তদ্রূপ ভাবে রোগীর নাড়ী টিপিয়া ছাত্র বলিলেন "আপনি কুপথ্য করিয়াছেন।" রোগী বলিল "না কই?" ছাত্র, রোগীর ঘরের চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়া জুতা ভিন্ন আর কিছু দেখিতে না পাইয়া কহিলেন—"আপনি জুতা খাইয়াছেন।" ইহার পর রোগীর গৃহ হইতে তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইল। ফলে বুদ্ধি না থাকিলে সংসার ক্ষেত্রে কিছুতেই অগ্রসর হওয়া যায় না।

আর এক প্রকার হাতুড়িয়া আছেন তাঁহারা কেবলই শিক্ষা দাতার অনুকরণ করেন, বুদ্ধি না থাকিলে অনেক সময় সস্ত কুফল জন্মে। একদা এক চিকিৎসকের সঙ্গে ছাত্র চলিয়াছে, এক গ্রামে এক গৃহস্থের নিকট গিয়া কবিরাজ এক গলা ফুলা উষ্ট্র পাইলেন। গৃহস্থ কবিরাজকে সে উট দেখাইলে তিনি কহিলেন "আমি ভাল করিতে পারিব।" তার পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "উট কাহা গিয়া'? গৃহস্থ উত্তর করিল "জঙ্গলমে গিয়া।" কবিরাজ বলিলেন "ক্যা খায়া"? গৃহস্থ কহিল "কাটা কুটা খায়া।" কবিরাজ বলিলেন "ল্যাও একঠো শীল", তখনই একটী শীল আনা হইল।

কবিরাজ খুব জোরে উটের গলায় ঘা দেওয়ায় অপরদিক দিয়া কাঁটা বাহির হইয়া গেলে উট ভাল হইল। ইহা দেখিয়া ছাত্র মনে করিল, "কবিরাজ মহাশয়ের এই চিকিৎসা শিক্ষা করিয়াছি।" এই ভাবিয়া ছাত্রটী এক গ্রামে গিয়া একটী গলা ফুলা স্ত্রীলোক দেখিয়া মনে করিল, এই আমার উপযুক্ত সুযোগ হইয়াছে। "ছাত্র গৃহস্থকে বলিল "আমি এই রোগী আরাম করিতে পারিব, কতকগুলি মন্ত্র বলা বলির পর একটী শীল আনিয়া দিলেই রোগী আরাম করিয়া দিব।" ইহার পর ঐরূপ মাত্র বলাবলি করিয়া যখন "ল্যাও একঠো শীল"—বলিল, তখনই শীল আসিল, তাহার পর সজোরে আঘাত করিতেই রোগিণী পঞ্চত্ব পাইল। তার পর চিকিৎসকের উপর কি ব্যবস্থা হইল বুঝিতেই পারেন। বুদ্ধি না থাকিলে এইরূপ কবিরাজের অনুকরণ করিতে গেলে ঘোর বিপদ সর্ব্বদাই ঘটে।

একদা এক চক্ষুরোগী কবিরাজের অনুপস্থিতিতে আসিয়া উপস্থিত, রোগী আসিলেই ছাত্র পুস্তক দেখিতে লাগিল এক স্থানে দেখিতে পাইল "চক্ষুরোগে সমুৎপন্নে কর্ণং ছিত্ত্বা কটিং দহেৎ।" ইহা দেখিয়াই ছাত্র লাফাইয়া উঠিল, এইত আমার সুযোগ উপস্থিত, অধ্যাপক মহাশয় উপস্থিত থাকিলেত আর হইবে না, এই বেলা চিকিৎসা করিয়া ফেলি। ছাত্র ভৃত্যকে ডাকিয়া একটা কাঁচি আনিতে ও কয়েকটা টিকা জ্বালাইয়া আনিতে কহিয়া দিল। অনুজ্ঞা মত কাজ হইলে রোগীকে গৃহে নিয়া জোর করিয়া দুই কর্ণ কাটিয়া ফেলিল, রোগীর চীৎকারে গ্রামময় সাড়া পড়িয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে কটি পোড়াইয়া দেওয়া হইল। এই কার্য্যের অব্যবহিতর পরেই অধ্যাপক কবিরাজ আসিয়া উপস্থিত হইয়া কহিলেন হায়, কি সর্ব্বনাশ করিয়াছিস্। ছাত্র কহিল, "আমি পুস্তকে ঐ বচন দেখিয়াই করিয়াছি।" কবিরাজ পুস্তক আনাইয়া পুস্তক দেখাইয়া বলিলেন, "অনুধাবন কর নাই বলিয়াই বিপদ ঘটিয়াছে। বচনটার পরেই ক্ষুদ্রাক্ষরে "ইতি অশ্ব চিকিৎসা" লিখা রহিয়াছে, তাহা না দেখাতেই সর্ব্বনাশ হইয়াছে।" ফলে যে সকল ছাত্র কবিরাজী পড়িতে যান অনেকেই বচনের অর্থ বোধ করেন না আর ভাব ও বুঝেন না। সুতরাং তাহারাই এক করিতে আর করেন, শিব গড়িতে বানর গড়েন। এই সকল চিকিৎসকের সংখ্যা লোপ না পাইলে আয়ুর্ব্বেদের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকিবে না। এদকলের জন্য ছাত্রেরা যত অপরাধী, দেশের লোক ও অধ্যাপকগণ ততোধিক অপরাধী। অতএব আয়ুর্ব্বেদের মান রক্ষা করিতে হইলে সকলকেই সাবধান হইতে হইবে। ব্যবসায়ী লোকের স্বীয় ব্যবসায় অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে ততোধিক সাবধান হইতে হইবে।

কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্থ কর্তৃক ২০৯, কর্ণওয়ালীশ ষ্ট্রীট্, গোবর্দ্ধন প্রেস হইতে মুদ্রিত ও ১৭।১৯নং শ্যামবাজার ব্রিজ রোড হইতে মুদ্রাকর কর্তৃক প্রকাশিত।

আয়ুর্ব্বেদ

৭ম বর্ষ } আষাঢ় ১৩৩০ সাল। { ১০ম সংখ্যা।

সোমরস ও তাহার সেবন বিধি।

—:o:—

ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহ আলোচনা করিলে "সোমরস" নামে একপ্রকার পদার্থের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। জগতের অতি প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদ হইতে, আর আধুনিক তন্ত্র ও পুরাণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত সংস্কৃত সাহিত্যে "সোমরস" শব্দের ভূরি ব্যবহার দেখা যায়। এই সোমরস প্রাচীন ভারতে এরূপ আদৃত ও প্রচলিত ছিল যে, উপন্যাস লেখক, নাটককার, কবি, এমন কি ইতিহাসবেত্তা ও আলঙ্কারিকেরা পর্য্যন্ত ইহার উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই। এই সোমরস কি এবং কোথায় পাওয়া যায়—এ বিষয় লইয়া বহুদিন পর্য্যন্ত প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ সমাজে ঘোর তর আন্দোলন চলিতেছে। ইংলণ্ড, জর্ম্মণি এবং কলিকাতা ও বোম্বায়ের প্রসিদ্ধ সংস্কৃত ভাষাবিদ পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে ৫।৭ বৎসরকাল ক্রমিক তর্কবিতর্ক করেন এবং এই অজ্ঞাত পদার্থের স্বরূপ নির্ণয়ার্থ বহুস্থান পর্য্যটন করেন। কিছুকাল পূর্ব্বে কলিকাতা আসিয়াটিক সোসাইটির সভ্যেরা সোমরস সম্বন্ধে পুনরায় বাদানুবাদও করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে ইহারা কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহা ঐ সোসাইটির সাময়িক পত্রিকার প্রকাশিতও হইয়াছিল*।

সে যাহা হউক আমরা বহুদিন হইতে বিবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ আলোচনা দ্বারা এবং নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া সোমরস সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, এই সুযোগে বর্ত্তমান প্রস্তাবে তাহা বিশেষ করিয়া প্রতিপাদ্য করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বহুদিনের অপ্রতিহত পরিশ্রম ও অর্থ বলের পর সোমরস সম্বন্ধ আমরা যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছি, তাহা পাঠকগণ এবং আসিয়াটিক সোসাইটির সভ্যদিগের নিকটই উপাদেয় বলিয়া বিবেচিত হইবে—এই ভরসায় আমরা এই গুরুতর প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম।

* Journal of the Asiatic Socicty Bengal.

সোমরস, আর্য্য ঋষিদিগের একপ্রকার পানীয় দ্রব্য। ইহা সকল শ্রেণীর লোকদিগেরই সেব্য ছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চারিবর্ণ ই ইহা পান করিত। সংসার ত্যাগী, যোগী, সন্ন্যাসীদিগেরও ইহা পান করিতে নিষেধ ছিলনা, বরং যোগসাধনে ইহার ব্যবহার ছিল, যথা—

"যুগে যুগেঽপি কর্ত্তব্যো যোগিনো যোগ সাধনে। পিয়েৎ সোমরসং ভদ্রে আয়ুর্মেধা বলপ্রদং।" শিবসংহিতা।

পূর্ব্বকালে সোমরস যজ্ঞস্থলে ব্যবহৃত হইত। সোমরস কাহারও গৃহে পান করিবার নিয়ম ছিল না। দেবতা মন্দিরে, কোন পীঠস্থানে না হয় যজ্ঞস্থলে ইহা পান করিতে হইত, তদ্ভিন্ন অন্যত্রে পান করিবার নিষিদ্ধ নিয়ম ছিল। যদি কেহ কোনস্থলে সোমরস পান করিবার জন্য অভিলাষী হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সেইস্থলে দেবারাধনা করিয়া সেই স্থানটিকে পবিত্র করিয়া লইতে হইত। অথবা যজ্ঞের আয়োজন করিয়া লইতে হইত। যজ্ঞে যে সকল দ্রব্য দেবোদ্দেশে প্রদান করা হইত, তাহার মধ্যে সোমরস প্রধান ছিল। অগ্রে সোমরস প্রদান না করিলে যজ্ঞক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইত না। সকল যজ্ঞেই যে সোমরস প্রদান করা হইত এমন নহে, কোন কোন যজ্ঞে দেওয়ার রীতি ছিল, তাহা পরে বলা যাইতেছে।

আর্য্যদিগের মধ্যে নানাপ্রকার যজ্ঞানুষ্ঠানের রীতি প্রচলিত ছিল। তন্ত্রে দেখা যায়, প্রাচীন ভারতে ৬৭ প্রকার যজ্ঞ ছিল। সেই সকল যজ্ঞ আবার ১০৩ ভাগে বিভক্ত ছিল, তাহাদের নাম ছিল ব্রত। এই ৬৭ প্রকার যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য বিশেষ বিশেষ বেদী ছিল। সেই সকল বেদীর আকার মোটে ৬ প্রকার, যথা এক কোণী, ত্রিকোণী, চতুষ্কোণী, অষ্ট কোণী, বৃত্তা এবং দন্তী। বেদীর আকার এই ৬ প্রকার। ইহার মধ্যে এক কোণী, ত্রিকোণী, চতুষ্কোণী ও দন্তী—এই চারি প্রকার বেদী যে যে যজ্ঞে নির্ম্মিত হইত, সেইগুলিতেই সোমরসের ব্যবহার ছিল। অন্য যজ্ঞে ইহা ব্যবহৃত হইত না। বেদীর মধ্যস্থলে একটি বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড রাখা হইত। ব্রাহ্মণ (পুরোহিত) বেদীর একপার্শ্বে উপবেশন করিয়া সর্ব্ব প্রথমে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিমধ্যে সোমরস নিক্ষেপ করিতেন। তদনন্তর সোমরসের পূজা ও সোম দেবতার আরাধনা করিবার জন্য অনুষ্ঠান আরম্ভ হইত। যজ্ঞানুষ্ঠান শেষ হইলে, আর্য্যগণ সকলে মিলিয়া সোমরস পান করিতেন। সোমরস একটি পাত্রে ফেলিয়া তাহাতে বেদী মধ্যস্থ অগ্নিকুণ্ডের কিঞ্চিৎ ভস্মাবশেষ মিশ্রিত করা হইত, তাহার পরে তাহা পান করা হইত।

যজ্ঞের পুরোহিত প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডমধ্যে সোমরস নিক্ষিপ্ত করিয়া সোম দেবতার আরাধনা করিতেন এবং অপরাপর দেবতার নামোল্লেখ করিতেন। কোন দেবতার উদ্দেশে—যে উপাসনা করা হইত, তাহার অর্থ এইরূপ "হে সোম, তুমি আমাদের রক্ষক, তুমি আমাদের প্রভু। তুমি যজ্ঞস্থলে দিব্যরথ সহ উপস্থিত হও। আমরা সোমরস গ্রহণ করি ইত্যাদি।" এই সকল ছন্দোবদ্ধ ঋক্ বা উপাসনার শ্লোক ভক্তি রসার্দ্রচিত্তে উচ্চৈঃস্বরে গান করা হইত। উপগীয়মান স্বর গ্রামের প্রতি তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল।

অতি শুদ্ধ স্বর সংযোগে উচ্চারণ বৈষম্য সংঘটিত হইলে, তাঁহারা আপনাদিগকে প্রত্যবায়গ্রস্ত ও প্রণষ্টশক্তি মনে করিতেন এবং তদ্ধেতু সোমরস পানে তাঁহাদের তৃপ্তি হইত না।* এই উপাসনার গানে তাঁহারা তিন প্রকার বৈদিক স্বর ব্যবহার করিতেন, তাহা এই,—উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিত। এখনকার উদারা, মুদারা ও তারাকে ইহাদের প্রতিনিধি স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। উদাত্ত—নিওগ, অনুদাত্ত—ঋওগ এবং স্বরিত কখন কখন ষড়জ ও পঞ্চমের সহিত ঐক্য হয়। এইরূপ একটি চিহ্ন (।) বেদের মন্ত্রের উপরে থাকে, তাহা হইলে স্বরিত এবং যদি নিম্নে থাকে তাহা হইলে অনুদাত্ত বুঝিতে হইবে। আবার এই গান করিবার সময় বাদ্যেরও প্রচলন ছিল। তখন যদিও বিশুদ্ধ বাদ্যের সৃষ্টি হয় নাই, কিন্তু ঋগ্বেদে দেখা যায় তৎকালীন মহর্ষিরা সোমরস আরাধনা কালীন এবং সোমরস পান কালীন পুলকিত চিত্তে গীতবাদ্য করিতেন। বৈদিক বাদ্যের তালের কিছু নমুনা আমরা দিতেছি। যথা হা, হী হী হা, হা হী হী হী হী হী হা, হাং হীং বুহা। পম্‌পশো পাং পং হাং উং হুং ইত্যাদি। এই প্রকার গীতবাদ্য করিতে করিতে আমোদে সোমরস পান করা হইত।

যাহা হউক এক্ষণে সোমরস জিনিসটা কি এবং কোথায় পাওয়া যায়, দেখা আবশ্যক। এ বিষয়ে পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে নানাপ্রকার মতভেদ হইয়াছে। কেহ কেহ ইউরোপীয় কুল ও স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া গতানুগতিক পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতেও ছাড়েন নাই। আবার কেহ কেহ বা একেবারে হাস্যকর মতাবলীর সৃষ্টি করিয়া হাস্যাস্পদ হইয়াছেন। যাহা হউক সোমরস সম্বন্ধে কতিপয় সংস্কৃত শাস্ত্রবিৎ জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতের মত এস্থলে কিয়ৎ পরিমাণে আলোচনা করিলে বোধ হয় অযুক্তি সঙ্গত হইবে না।

পণ্ডিতবর সার উইলিয়ম জোন্স ও হোরেশ উইলশন সাহেব বলেন, সোমরস একপ্রকার বৃক্ষের পাতার রস। সুপ্রসিদ্ধ রাজস্থান ইতিহাস লেখক টড সাহেব নির্দ্দেশ করেন যে, ইহা একপ্রকার বৃক্ষের মূলের রস **। মান্দ্রাজবাসী জনৈক তৈলঙ্গী পণ্ডিত বলিয়াছেন—'গুড়ূচী'—প্রাচীনকালে 'সোমরস' বলিয়া অভিহিত হইত। আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যাভিধানে, 'বামনহাটী' অথবা 'ব্রাহ্মীশাক'—'সোমলতা' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কাহারও মতে 'সোমরস' ফল বিশেষের রস মাত্র। ইংলিসম্যান সম্পাদক বলেন, রক্তবর্গের এক প্রকার লতা সোমলতা বলিয়া উল্লিখিত হয়। ঐ লতার রস স্নিগ্ধ, সুগন্ধ এবং অম্ল মধুর †।

* Mulrs Sanskrit text,

* ভারতীয় গ্রন্থাবলী। ১ম খণ্ড—১৮ পৃষ্ঠা।

† Thc "some" Plant of vedas was the Asclepias Acid of Roxborgh, now known as the twining Plant with few leaves; and with clusters of small and fragrant flowers, It yields a mild acid milky juice and grows in various parts of India." The Englishman, 23nd July 18/8. And also vids Lecture on the Religious suts of India" P 32 by R. N, Datta.

** Greens vedie litereraturе V. I P. 2.

অধ্যাপক গ্রিণ সাহেব গ্রীস দেশীয় স্বর্য্যলতার (Sunplant) সহিত এই সোমলতা ও সোম রসের তুলনা করিয়াছেন। এই রসে মাদকতা শক্তির বৃদ্ধি হয়, ইহা উত্তেজক এবং প্রচণ্ড সুরার (Strong wine) ন্যায় কার্য্য করে। এক জন অধ্যাপক বলিয়াছেন—সোমরস কল্পিত দ্রব্য মাত্র। আর একজন মহাত্মা বলেন,—সোমরস চন্দ্র কিরণ!! বেদে লিখিত আছে, সোমলতার রস তৃপ্তিকর, মাদক, হর্ষ জনক, পুষ্টিকারক, রোগনাশক এবং সুমিষ্ট। যথা,—

(ক) প্রবোমিয়স্ত ইদং বোমৎসরা মাদয়িষ্ণবঃ। দ্রপ্সা মধ্বশ্চ মুষদঃ।

(খ) গয়স্কানো অমিহা বসু বিৎ পুষ্টি-বর্দ্ধনঃ।

পণ্ডিত কালীবমল সর্ব্বেভৌম বলেন,—সোমলতা নামক লতা বিশেষের মূল হইতে সোমরস নির্গত হয়। ইহা দুগ্ধের ন্যায় শ্বেত ও তরল। * * * ইহা রীতিমত সেবন করিলে মনুষ্য লাবণ্যযুক্ত ও দীর্ঘজীবি হয় এবং প্রভুল ক্ষমতাশালী ও পুষ্টকায় হয়। অধ্যাপক ওরেবর বলেন,—"রীতিমত ঔষধের ন্যায় সোমরস সেবন করিলে শরীর কন্দর্পের ন্যায় কান্তি ধারণ করে এবং শরীরে প্রকৃত বল হয়। একবার সোমরস সেবন করিয়া একদমে ৫।৬ ক্রোশ যাওয়া যায়। * বেদ পাঠে জানা যায়, সোমরসের বর্ণ জলের ন্যায় তরল এবং দুগ্ধের ন্যায় গাঢ়। বেদের "সস্তে পয়াংসি সমুচন্তু রাজা এবং রাজসুতে বরুণস্য ব্রতানি বৃহস্পতে বৎ তব সোমধাম "—প্রভৃতি শ্লোক দ্বারা ইহার দুগ্ধের ন্যায় গাঢ়ত্ব এবং জলের ন্যায় তরলত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে।

সোমরস যে সোম নামধেয় এক প্রকার লতার রস এ বিষয়ে সন্দেহ থাকিতেছে না। এই লতা পার্ব্বত্য প্রদেশে জন্মিয়া থাকে। বেদেও ইহা পার্ব্বতীয় বলিয়া কথিত আছে যথা,—"বৎসানোঃ সানুমারুহৎ ভূর্য্য স্পষ্ট কর্ত্ত্বং। তদিন্দ্রোর্থং চেততি যূথেন বৃষ্টি রেজতি। এই সোমরস উজ্জ্বল (Spraking) এবং দেখিতে সুন্দর। মহর্ষি বাল্মিকী রাম চন্দ্রের রূপ বর্ণনার স্থলে বলিয়াছেন, সোম বৎ প্রিয় দর্শনঃ। অর্থাৎ সোমের ন্যায় দেখিতে সুন্দর। এতদ্বারা সোমলতা ও সোমরসের সুন্দর শ্রীত্ব প্রতিপাদ্য হইতেছে। হরিবংশ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থেও এইরূপ উল্লেখ আছে। অথর্ব্ব বেদে লিখিত আছে, স্বর্গে যেরূপ অমৃত, মর্ত্ত্যে সেইরূপ সোমরস। যোগ শাস্ত্রে আছে, "পবনাভ্যাস যোগ সাধনা করিলে যে ফল পাওয়া যায়, একবার সোমরস সেবন করিলে তদ্রূপ ফল পাওয়া যায়।"

কোন কোনও পণ্ডিত বলেন, 'সোমলতা বা সোমরস এখন আর পৃথিবীতে পাওয়া যায় না। সোমাভাবে পার্থিবামৃতকে তাহার প্রতিনিধি স্বরূপ গ্রহণ করিতে হয়।" এই পার্থিবামৃত কি দেখা উচিত। পার্থিবামৃত শব্দে জল বলিয়া লিখিত আছে। অমর কোষে এবং ঋগ্বেদে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা—(ক) "পয়ঃ কিলালমমৃত মিত্যমর কোষঃ। (খ) অপস্বন্তর মৃতমপসু ভেষজ মপসু তেজঃ প্রশস্ত য়ে দেবঃ ভবতবাজিনঃ। ঋগ্বেদ ১।২৩।১৯ (গ) অপসমে সৌমো অব্রবীদন্ত বিশ্বানি ভৈষজা অগ্নিঞ্চ বিশ্বশম্ভুবং

* Vedio India No IX PP 17-28

আপশ্চ বিশ্ব ভেষজীঃ। ১।২৩.২০ ঋগ্বেদ।" তবে এত অনুসন্ধান ও পরিশ্রমের পর সোমরস কি জল বলিয়া প্রতিপন্ন হইল! ইহা বিশ্বাস করিতে বুদ্ধি প্রতিহত হয়, হৃদয় সঙ্কুচিত হয়। শাস্ত্রে, পার্থিবামৃত অর্থে জল বলিয়া উল্লেখ আছে, কিন্তু সোমরস যে জল তাহা কোথাও উল্লিখিত হয় নাই। সোমাভাবে জলের ব্যবহারের কথাও কোথাও দেখি নাই। অতএব এমনটি বিশ্বাস বা যুক্তি সঙ্গত নহে।

জর্ম্মন দেশীয় কতিপয় পণ্ডিত, Aseipas Acidia কেই সোমলতা বলিয়া উল্লেখ করেন। ইহা কতদুর বিশ্বাস যোগ্য বলিতে পারি না। অপর কেহ কেহ সোমলতাকে পুঁইশাক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সামবেদের ষড়বিংশ ব্রাহ্মণের এক আখ্যায়িকায় উক্ত হইয়াছে যে, সোমলতা পথিবীতে আর উৎপন্ন হয় না। এজন্য অন্য দ্রব্যকে ইহার প্রতি-নিধি করিয়া যজ্ঞস্থলে আনয়ন করিতে হয়। শ্রুতিগ্রন্থে সোমাভাবে পুতিকা (পুঁই) শাকের বিধি আছে। যথা—"সোমাভাবে পুতিকা-মতি সুনুয়াৎ।" ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে সোমাভাবে পুতিকা বিধানের অনেক শ্লোক আছে। অথর্ব্ব-বেদের একস্থলে 'পুতিকরঞ্জলতা' সোমলতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বেদে সোমলতার আকার যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পুঁইশাক বলিয়াই আপাততঃ বিশ্বাস জন্মে। পুতিকা শাকের যেরূপ তন্তু (আঁশ) থাকে, সোমলতার তাহাই ছিল। ইহাকে সোমতন্তু কহে, যথা, "অপ্যায়স্বমন্দিতম সাম বিশ্বে ভিরংশুভিঃ! ভবানঃ সুশ্রবস্তনঃ সন্ধাবৃযে।" (১৪ অধ্যায়। ১০ সূক্ত) অধ্যাপক হাগ সাহেব পুনা হইতে যে সোমলতা আনিয়াছিলেন তাহার আকার পুতিকা শাকের সহিত অনেকটা ঐক্য হইয়াছিল, কিন্তু তাহার আস্বাদ অতীব তিক্ত এবং দুর্গন্ধ যুক্ত। * অনেকে বলিয়াছেন, ইহা প্রকৃত বৈদিক কালীন সোমলতা নহে * *।

সে যাহাহউক আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে সোমলতার আকার পুঁই শাকের ন্যায়। কিছুদিন পূর্ব্বে আমি কতিপয় পণ্ডিতের সহিত বেলগেছিয়ায় গিয়াছিলাম। তথায় সোম-রসের উল্লেখ হওয়াতে বানিয়ালাল বাজি নামধেয় জনৈক পার্ব্বত্য দেশীয় মোহান্ত আমাদিগকে এক লতা দেখাইয়া ছিলেন, তাহা আকৃতিতে কোমল পুতিকা শাকের মত। আমরা ৪।৫ জনে উহা আস্বাদন করিয়া ছিলাম। তাহার স্বাদ, ঈষৎ অম্ল মধুর বলিয়া বোধ হইল। উহার পত্র পুতিকা শাকের পাতার মত, কিন্তু তত বৃহৎ নহে। আমি ভ্রম বশতঃ উহাকে প্রথমে পুঁইশাক বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলাম, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। উহা পুঁই জাতীয় বটে, বন পুয়ের সহিত অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে। * ঐ মোহান্ত প্রতিদিন উহার রস প্রায় এক ছটাক পরিমাণে পান করেন, তাহাতে উঁহার নেশা হয়। তিনি পূর্ব্বে গাঁজা, চরস এবং অহিফেন সেবন করিতেন, কিন্তু এই রস সেবন করা

---

* Aid Br val II P 439

* * Edinburgh Rtvew val LX No IV.

* History of Thibet by colonel Rayse P. 86 and Buddha in Thibet P. 17.

অবধি তাঁহার এ সকলের আর প্রয়োজন হয় নাই। মোহান্ত আমাকে উহা উপঢৌকন দিয়াছিলেন আমি তাহা ভারতবর্ষীয় সুশিক্ষো-ন্নতি সভার (* *) বিলাতস্থ পৃষ্ট পোষক শ্রীযুক্ত মে মুয়ার্শ হুইটলি বড় এবং কোম্পা-নীকে লণ্ডনে পাঠাইয়াছিলাম। তাঁহারা বহুবিধ পরীক্ষা দ্বারা বলিয়াছেন, ইহা প্রকৃত বৈদিককালীন সোমলতা বটে। (**) সংপ্রতি পাণ্ডুয়া রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকট-বর্ত্তী এদিনা মস্‌জিদের নিকট এক প্রকার লতা দৃষ্ট হইয়াছিল। ঐ লতা তিব্বৎ দেশীয় এক প্রকার লতার সহিত ঐক্য হয়। তিব্বৎ দেশীয় লোকেরা ঐ লতাকে বৈদিককালীন লতা বলিয়া বিশ্বাস করেন। তিব্বৎ দেশে ঐ লতার নাম "মানীর"

তত্রত্য বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী পণ্ডিতেরা মানী-রের যেরূপ রূপ ও গুণ বর্ণনা করেন, পাণ্ডু-য়ার প্রাপ্য লতা অনেকাংশে তদ্রূপ। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানীর জনৈক গার্ড উহা প্রাপ্ত হইয়া স্বদীয় রস আস্বাদন করিয়া-ছিলেন। উহার আকৃতি ও প্রকৃতি সোমরসের ন্যায় প্রতীত হয়। ইহার স্বাদ অম্ল মধুর। ইহা মাদক, ক্ষুৎ পিপাসোদ্দীপক, উদরের পীড়ানাশক বিষয় এবং তৃপ্তিজনক। ইউরোপীয়েরা ইহাকে Semila Genia কহিয়াছিলেন। বাস্তবিক তাহা নহে। আমি উহা রীতিমত আস্বাদন এবং পরীক্ষা করিয়া উহাকে Genus moilatee বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় এই মানিবা লাল বাজির প্রদর্শিত সোমরসের সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে। যাহা-হউক, সোমলতার আকার অনেকটা যে বন পুঁইয়ের মত সে বিষয়ে আমার কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বকালে নানা প্রকার সোমলতা ছিল। এক্ষণে যত দুর অনুসন্ধান দ্বারা জানা গিয়াছে তাহাতে দেখিয়াছি, এখনও ২৪ প্রকার সোমলতা পাওয়া যায়। অন্বেষণ করিলে ইহা মিলিতে পারে। এই ২৪ প্রকারের নাম অংশুমান, মুঞ্জমান, চন্দ্রমা, রাজত প্রভা, দুর্ব্বাসোম, কমীয়ান, শ্বেতাক্ষ, কণক প্রভা, প্রতানবান, তালবৃন্ত, করবীর, অংশ-বান, সয়ম্ভূ, মহাসোম, গাড়ূরাহৃত, গায়-ত্রাইষ্ট্রেষ্টুভ, পাউক্ত, জাগড়, শঙ্কর, অগ্নিষ্টোম, রৈবত, ত্রিপদীযুক্তা, গায়ত্রী, উড়ুপাতি। এই সকল সোমলতার প্রত্যেকের ১৫টির অধিক পত্র হয় না। লতা ও আকারে বড় দীর্ঘ নহে, কিন্তু বড় স্থূল ও সরস। "মহাসোম" নামক সোমলতার বিংশতিটি পত্র দেখা গিয়াছে। এই সকল লতার পাতা শুক্ল পক্ষে জন্মে এবং কৃষ্ণ পক্ষে পতিত হয়। অমাবস্যাতে সমুদায় পত্র নষ্ট হইয়া কেবলমাত্র লতাবশিষ্ট থাকে। এই সকল লতার তেজ শরৎকালে কিছু প্রখর হয়।

শাস্ত্রে আছে, হিমালয়, সহ্য, মাহেন্দ্র, মলয়, স্ত্রী, দেবগিরি, পারিপাত্র, বিন্ধ্য এবং বিতস্তা নাম্নী নদীর উত্তরে যে সকল পর্ব্বত আছে, তথায় সোমলতা পাওয়া যায়। সিন্ধু নামক মহানদে, কাশ্মীরের মানস সরোবরে, দেবহৃচ্ছ নামক হ্রদে সোমলতা প্রাপ্ত হইবার

(**) সোমপ্রকাশ ৯ আশ্বিন ১২৮৪।

(***) ভারতীয় গ্রন্থাবলী ১ম খণ্ড ১৯ পৃষ্ঠা।